Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাজু খন্দকার

রোলঃ 228012152

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাজু খন্দকার

রোলঃ 228012152

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ রাজু খন্দকার, আইডিঃ 228012152 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআন-হাদিসের আলোকে দাওয়াত ও তাবলিগ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোঃ রাজু খন্দকার

আইডিঃ 228012152

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা :

ইসলাম মানবজাতির জন্য প্রেরিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর মূল ভিত্তি হলো— আল্লাহর উপর বিশ্বাস, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য, এবং সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। এই মহান ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলেও এর কার্যকারিতা বিস্তৃত। ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশনা হলো— মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানানো এবং অকল্যাণ থেকে দূরে রাখা। এই মহান দায়িত্ব ও প্রচারক কার্যক্রমকে বলা হয় "তাবলীগ"।

'দাওয়াত' শব্দটি আরবি **دعوة** থেকে যার অর্থ হচ্ছে আহ্বান, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় দাওয়াত হলো—মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও ইসলামি আদর্শের দিকে আহ্বান করা এবং জীবনকে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

'তাবলীগ' শব্দটি এসেছে আরবি **بلغ** থেকে, যার অর্থ পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ, নবী করীম (সা.)-এর প্রদর্শিত সত্য বার্তাকে যথাযথভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এটি দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ•

"হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছালেন না।"
(সূরা আল-মায়িদা, ৫:৬৭)

এ আয়াত থেকেই বোঝা যায়, তাবলীগ তথা সত্য বার্তা পৌঁছে দেওয়া নবীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। শুধু নবী নয়, তাঁর উম্মতের প্রতিও এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এবং তারাই সফলকাম।"
(সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াতি দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৬১)

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন:

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কাছ থেকে কিছু শুনে তা মুখস্থ করে রাখে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয় ঠিক যেমনটি সে শুনেছে।"
ইবনু মা-জাহ (২৩০)

এইসব আয়াত ও হাদীস থেকে বোঝা যায়, দাওয়াত ও তাবলীগ শুধু নবী বা আলেমদের দায়িত্ব নয়; বরং প্রতিটি ঈমানদারের ওপর এটি একটি ফরজে কিফায়া বা ফরজে আইন হতে পারে, পরিস্থিতি অনুযায়ী।

ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখি—রাসূলুল্লাহ (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে দাওয়াতি কাজ করেছেন, কখনও এককভাবে, কখনও দলগতভাবে। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর এই দায়িত্বকে নিজেদের জীবনের মিশন বানিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের প্রচারক হিসেবে তারা পূর্ব-পশ্চিমে বহু অঞ্চল বিজয় না করেই মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও মিডিয়ার প্রভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি অনেক মুসলমান দ্বীনের মূল জ্ঞান ও চেতনা থেকেও দূরে সরে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব অনেক বেশি।

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

দা'ওয়াহ বা দাওয়াহ অথবা দাওয়াত আরবি دعوة মানে ইসলামের প্রচার। দা'ওয়াহ আক্ষরিক অর্থে "আমন্ত্রণ" করাকে বোঝায়, ক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ যার অর্থ বিভিন্নভাবে "ডাকা" বা "আমন্ত্রণ জানানো'। একজন মুসলিম যিনি ধর্মীয় কর্মী হিসাবে বা স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় দা'ওয়াহ অনুশীলন করেন, তাকে দাঈ, বহুবচন দুআত বলা হয়। এইভাবে একজন দাঈ এমন একজন ব্যক্তি যিনি মানুষকে একটি সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলাম বোঝার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং কিছু ক্ষেত্রে মিশনারির ইসলামিক সমতুল্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, যিনি মানুষকে বিশ্বাস, প্রার্থনা বা ইসলামিক জীবনে আমন্ত্রণ জানান।

তাবলিগ ((تَبْلِيغএকটি আরবি শব্দ যা ") "بلغবালাগা) ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর শাব্দিক অর্থ হলো "বার্তা পৌঁছানো" বা "সম্পূর্ণভাবে জানানো"। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটি একটি মাসদার যার অর্থ কোনো বিষয় বা বক্তব্য যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ইসলামী প্রেক্ষাপটে, তাবলিগ বলতে বোঝানো হয় আল্লাহর বাণী—কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ—মানুষের মাঝে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজ, যা শুধুমাত্র তথ্য প্রদান নয় বরং হৃদয়কে স্পর্শ করার মতোভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। একজন মুসলিম যিনি এই কাজে নিয়োজিত থাকেন তাকে মুবাল্লিগ বলা হয়। তাবলিগের কাজ নবী-রাসূলদের প্রধান দায়িত্ব ছিল এবং পরবর্তীতে উম্মতের ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু বার্তা পৌঁছে দেওয়া" (সূরা মায়িদা: ৯৯)। আজকের যুগে তাবলিগ জামাত নামক একটি বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিতভাবে এই কাজ পরিচালিত হচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকে নামায, সুন্নাহ ও আখলাকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে থাকেন। এইভাবে তাবলিগ শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়, বরং একটি বিস্তৃত ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্মপন্থা, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি উপায়।

কুরআনে দাওয়াত ও তাবলীগ : ০৭, সংখ্যা: ০৯

যিলকদ-১৪৩২ || অক্টোবর-২০১

দাওয়াত একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ ডাকা, আহবান করা। ইসলামের দাওয়াতের সারকথা হচ্ছে, মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির দিকে আহবান করা। ইসলামের আবির্ভাব শুধু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইসলাম। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সৌভাগ্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : সালাহ ও ইসলাহ। অর্থাৎ নিজে সংশোধন হওয়া এবং অন্যকে সংশোধন করা। দাওয়াতের কাজ ছাড়া যা কখনো সম্ভব নয়।

দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত এত অধিক, যা কোনো মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে পারে না। পবিত্র কালামের অসংখ্য আয়াত যার উজ্জ্বল সাক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি আহবান করেছে, সৎ কাজ করেছে এবং বলেছে, আমি অনুগতদের একজন?' (সূরা হামীম আসসাজদাহ : ৩৩)

আল্লামা শাববীর আহমদ উছমানী রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, এই আয়াতে ঐ সকল বিশেষ প্রিয়ভাজন বান্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা একক আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের স্থিরতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছে। এখানে তাদের অপর একটি উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক সেই ব্যক্তি যে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদিত করে তাঁর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ঘোষণা দেয়, তাঁর মনোনীত পথে চলে এবং দুনিয়াবাসীকে তাঁর দিকে আসার আহবান জানায়। তার কথা ও কাজ অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসার জন্য প্রভাবিত করে। লোকজনকে সে যে সকল ভালো কাজের দাওয়াত দেয় সে নিজেও সেগুলো আমল করে। আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের ঘোষণা প্রদানে কোন সময়ে কোন স্থানে সামান্যতম সংকোচও বোধ করে না। তার জাতীয় পরিচিতি শুধু ইসলাম। সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোষ্ঠীপ্রীতি ত্যাগ করে নিজে খাঁটি মুসলমান হওয়ার ঘোষণা প্রদান করে এবং যার দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হয়েছিলেন এবং যার জন্য সাহাবায়ে কিরাম রা. নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সূরা নাহল-এ আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) 'ডাক স্বীয় প্রতিপালকের পথে পরিপক্ক কথা বুঝিয়ে এবং উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে। আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।'

এই আয়াতে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালীম দেওয়া হচ্ছে মানুষকে কিভাবে পথে আনতে হবে। এর তিনটি পন্থা বলা হয়েছে। ক) হিকমত, খ) মাওইযা হাসানা ও গ) জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান।

হিকমত অর্থাৎ মযবূত দলিল-প্রমাণের আলোকে হিকমত ও প্রজ্ঞাজনোচিত ভঙ্গিতে অত্যন্ত পরিপক্ক ও অকাট্য বিষয়বস্তু পেশ করতে হবে, যা শুনে সমঝদার ও জ্ঞানবান রুচিসম্পন্ন লোক মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার কাল্পনিক দর্শনাদি তার সামনে ম্লান হয়ে যায়। কোনো রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ যেন ওহী বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যকে পরিবর্তন করতে না পারে।

মাওইযা হাসানা-এর দ্বারা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশকে বোঝানো হয়েছে, যা কোমল চরিত্র ও দরদী আত্মার রস ও আবেগে থাকবে পূর্ণ। নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, দরদ ও মধুর চরিত্র দিয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় যে নসীহত করা হয় তাতে অনেক সময় পাষাণ-হৃদয়ও মোম হয়ে যায়, মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং একটি হতাশ ও ক্ষয়ে যাওয়া জাতি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। মানুষ ভয়-ভীতি ও আশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলে প্রবল বেগে, বিশেষত যারা অতটা সমঝদার, ধীমান ও উচ্চ মেধা-মস্তিষ্কের অধিকারী নয়, অথচ অন্তরে সত্য-সন্ধানের স্পৃহা প্রবল, তাদের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ওয়ায-নসীহত দ্বারা এমন কর্ম-প্রেরণা সঞ্চার করা যায়, যা উঁচু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব
হয় না।

হ্যাঁ, দুনিয়ায় সব সময় একটা দল এমনও থাকে, যাদের কাজই হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা এবং কথায় কথায় হুজ্জত করা ও কূটতর্কে লিপ্ত হওয়া। এরা না হিকমতপূর্ণ কথা কবুল করে, না ওয়ায-নসীহতে কান দেয়। তারা চায় প্রতিটি বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ময়দান উত্তপ্ত হোক। অনেক সময় প্রকৃত বোদ্ধা, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু স্তরের লোকদেরও সংশয়-সন্দেহ ঘিরে ধরে, আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তখন তাদেরও সন্তোষ লাভ হয় না। তাই বলা হয়েছে-'আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।'

অর্থাৎ কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে তখন উৎকৃষ্ট পন্থায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার এবং সত্যানুরাগ ও ন্যায়-নিষ্ঠতার সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করতে চাইলে তা উত্তম পন্থায় কর। অহেতুক বেদনাদায়ক ও কলজে-জ্বালানো কথাবার্তা বলো না, যা দিয়ে সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না; বরং তা আরও প্রলম্বিত হয়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করা ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রুক্ষতা, দুর্ব্যবহার, বাক-চাতুর্য ও হঠকারিতা কখনো সুফল দেয় না।
(তাফসীরে উছমানী ২/৬২৮-৬২৯)
অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-(তরজমা) মহাকালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নহে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর)
অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন : ক) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদের হিদায়াত ও প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা-তা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক, কিংবা আখিরাত সম্পর্কিত। খ) সেই ঈমান ও ইয়াকীনের প্রভাব কেবল মন-মানস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা; বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা প্রকাশ করা এবং বাস্তব জীবনে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো। গ) কেবল নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার ও কল্যাণ নিয়েই তুষ্ট না থাকা, বরং দেশ ও জাতির সামষ্টিক স্বার্থকেও সম্মুখে রাখা। দুজন মুসলমান একত্র হলে নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা একে অপরকে সত্য দ্বীন মেনে চলার এবং প্রতিটি কাজে সত্য ও সততা অবলম্বনের তাকীদ করা। ও ঘ) প্রত্যেকে একে অপরকে এই নসীহত ও ওসীয়ত করা যে, সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে যত বাধা-বিপত্তি, যত অসুবিধা ও বিপদাপদ দেখা দিবে, এমনকি যদি মন-মানসের বিরোধী কাজও বরদাশত করতে হয় তাহলেও ধৈর্য্য ও সবরের সঙ্গে তা বরদাশত করতে হবে। পুণ্য ও কল্যাণের পথ থেকে পা যেন কখনো ফসকে না যায় এই ওসীয়ত করতে হবে। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে এবং যিনি নিজে পূর্ণাঙ্গ হয়ে অন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা চালাবেন, কালের পৃষ্ঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আর এমন ব্যক্তি যেসব নিদর্শন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন তা 'বাকিয়াতে সালেহাত' তথা অবশিষ্ট নেক কাজ হিসেবে সর্বদা তার নেকীর খাতায় সংযোজন ঘটাবে। বস্তুত এই ছোট সূরাটি সমস্ত দ্বীন ও হিকমতের সার-সংক্ষেপ। ইমাম শাফেয়ী রাহ. যথার্থ বলেছেন যে, কুরআন মজীদে

কেবল যদি এই সূরাটিই নাযিল করা হতো, তাহলে (সমঝদার) বান্দাদের হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট ছিল। পূর্বকালের মনীষীদের মধ্যে দুজন একত্র হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তারা একে অপরকে সূরাটি পাঠ করে শুনাতেন। (তাফসীরে উছমানী ৪/৭৪৫)

আল্লাহ তাআলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন- তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতেই হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। আর তারাই সফলকাম। (সূরা আল ইমরান)

সূরা যারিয়াতে (আয়াত : ৫৫) আল্লাহ তাআলা বলেন, (তরজমা) 'আর তুমি বুঝাতে থাক। কারণ বুঝানো ঈমানদারদের উপকারে আসে।'

অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আপনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। এখন আপনার অত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সত্য না মানার যা দোষ তা সত্যদ্রোহীদের উপরই বর্তাবে। তবে বুঝোনো আপনার দায়িত্ব। তাই দাওয়াত ও তাবলীগের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখুন। যার ভাগ্যে ঈমান আছে আপনার উপদেশে সে উপকৃত হবে, ঈমান আনবে এবং যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছে তারা আরও বর্ধিত হারে উপকৃত হবে। আর অস্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হবে। (তাফসীরে উছমানী ৪/৩২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তাআলা বলেন- (তরজমা) হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।' (সূরা মুদ্দাসসির : ১-৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য এত ফিকির করতেন এবং উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন-(তরজমা) তারা যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস না করে তবে তাদের পেছনে মনস্তাপ করতে করতে হয়ত তুমি প্রাণপাত করবে। (সূরা কাহফ : ৬)

অর্থাৎ এই কাফিররা যদি কুরআনের কথা না মানে, তো আপনি তাদের দুঃখে বিলকুল পেরেশান হবেন না। আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করেছেন ও করে যাচ্ছেন, কেউ না মানলে আপনার অতটা মর্মাহত ও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ভেবে অনুতাপ করাও সমীচীন নয় যে, আমি এমন মেহনত কেন করলাম যা সফল হল না? আপনি সর্বাবস্থায় সাফল্যমন্ডিত। দাওয়াত ও তাবলীগ এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার যে কাজ আপনি করছেন তা আপনার

মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক। হতভাগার দল কবুল না করলে ক্ষতি তাদেরই। (তাফসীরে উছমানী ২/৭০১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের উপরও দাওয়াতের কাজ জরুরি। যেমন সূরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা বলেন- (তরজমা) বল, এই আমার পথ। আল্লাহর দিকে ডাকি বুঝে-শুনে আমি এবং যারা আমার সঙ্গে আছে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শরীক সাব্যস্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

অর্থাৎ এই খাঁটি তাওহীদের পথই আমার পথ। আমি বিশ্ব মানবতাকে আহবান করি যে, সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ছেড়ে এক আল্লাহর অভিমুখী হও এবং তাঁর তাওহীদ, তাঁর গুণাবলি ও বিধি-বিধান ইত্যাদির বিশুদ্ধ জ্ঞান বিশুদ্ধ পন্থায় অর্জন কর। আমি ও আমার সঙ্গীগণ অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং বিশুদ্ধ উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তির আলোকে এই সত্য সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এক আলো দান করেছেন, যাতে সব সাথীর দেল-দেমাগ সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে। কারও অন্ধ অনুকরণ নয়, বিশুদ্ধ তাওহীদের পথচারী প্রতিটি কদমে তার মন-মানসে আল্লাহর মারিফত ও অর্ন্তদৃষ্টির বিশেষ জ্যোতি ও পরম দাসত্বের স্বাদ উপলব্ধি করে অবচেতন মনে বলে ওঠে-'আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (তাফসীরে উছমানী ২/৪৫৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর প্রতিটি নবীকে যে মূল দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল—তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া, মানবজাতিকে সৎ পথে আহ্বান করা, এবং আল্লাহর বিধান প্রচার করা।

আয়াত:

يَـاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِ نْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَـتَهٗ ؕ وَا للّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّا سِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْـكٰفِرِيْنَ

বাংলা অনুবাদ:

হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি (তা) না কর, তবে (তার অর্থ হবে) তুমি আল্লাহর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের (ষড়যন্ত্র) থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না

(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৬৭)

এই আয়াতটি নবী করিম (সা.)-এর উপর দাওয়াহ ও তাবলীগের দায়িত্ব কতটা গুরুতর, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। আল্লাহ তাআলা রাসূলকে সরাসরি সম্বোধন করে বলছেন, "তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দাও।" অর্থাৎ ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনা, হুকুম-আহকাম, বিশ্বাস ও আচরণগত আদর্শ মানুষকে জানানো রাসূলের দায়িত্ব। এই আয়াতের ভাষা অত্যন্ত দৃঢ়; এতে বুঝা যায় যে, দ্বীন প্রচারে কোনো সত্যকে গোপন করা বা কোন দ্বিধা করা রাসূলের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ আরও বলেন, "যদি তুমি তা না করো, তবে তুমি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করোনি।" এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে, রিসালাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো— মানুষকে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। এই আয়াত দাওয়াত ও তাবলীগের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত, কারণ এটা কেবল রাসূলের দায়িত্ব নয় বরং তাঁর অনুসারীদেরও দায়— যারা রাসূলের মিশনকে সামনে এগিয়ে নেবে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে রয়েছে সান্ত্বনার বার্তা: "আল্লাহ তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।" রাসূল (সা.) যখন সত্য প্রকাশ করতেন, তখন অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করত, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সাহস দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, মানুষ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

শেষ অংশে বলা হয়েছে, "আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" অর্থাৎ যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য অস্বীকার করে, তাদের প্রতি হিদায়াতের দরজা বন্ধ থাকে, কারণ তারা নিজেদেরকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করে না।

এই আয়াত ইসলামী দাওয়াহ ও তাবলীগের গুরুত্ব এবং দায়িত্ববোধ অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরে। একজন দাঈ বা ইসলামের আহ্বানকারীকে সত্য বার্তা প্রচারে অকুণ্ঠ, নির্ভীক ও আন্তরিক হতে হবে। সমাজের চাপ বা ভয় তাকে থামিয়ে দিতে পারবে না, বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কাজ করে যেতে হবে। এ আয়াতের ভাষা মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দাওয়াত শুধু রাসূলের দায়িত্ব ছিল না, বরং তাঁর অনুসারীদেরও দায়িত্ব এখন সেই বার্তা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়া।

আয়াত:

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَا للهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

বাংলা অনুবাদ:
তাবলীগ (প্রচার কার্য) ছাড়া রাসূলের অন্য কোনও দায়িত্ব নেই। আর তোমরা যা-কিছু প্রকাশ্যে কর এবং যা-কিছু গোপন কর, সবই আল্লাহ জানেন।
(সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৯৯)
এই আয়াতটি দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর দায়িত্ব সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলছেন, "রসূলের দায়িত্ব কেবলমাত্র বাণী পৌঁছে দেওয়া।" অর্থাৎ, তিনি মানুষকে ইসলামের সত্য বার্তা ও নির্দেশনা জানিয়ে দেবেন, কিন্তু কেউ সেই বার্তা গ্রহণ করবে কি না, তা তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত। রাসূল বা কোনো দাঈ মানুষকে বাধ্য করতে পারেন না; বরং দাওয়াত দেয়াটাই তাঁদের কাজ।
এটি দাওয়াহকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। কখনো কখনো দেখা যায়, কেউ যখন বারবার দ্বীনের কথা বলেও ফল দেখতে পান না, তখন হতাশ হয়ে পড়েন। এই আয়াত তাদের মনে করিয়ে দেয়, হিদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ— আমাদের দায়িত্ব কেবল সত্যটি স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।
আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, **"আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন রাখো।"** অর্থাৎ, কেউ দ্বীনের আহ্বান বা দাওয়াতকে বাহ্যিকভাবে মেনে নিলেও অন্তরে কী আছে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। একইভাবে, কেউ যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে, কিন্তু অন্তরে সংশয় বা অনুসন্ধান থাকে, সেটাও আল্লাহর অজানা নয়। এই কথা দ্বীনের দাঈদের জন্য এক আশ্বাস—তারা যেন শুধু বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখে নিরাশ না হন।
এই আয়াত দাওয়াত ও তাবলীগের পথের অন্যতম মূলনীতি শিক্ষা দেয়: দায়িত্ব কেবল সত্যকে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া— গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান মানুষের স্বাধীনতা। দাঈরা যেন ফলাফলের চিন্তায় ভেঙে না পড়ে বরং আন্তরিকভাবে দ্বীন প্রচারে নিয়োজিত থাকে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে। আল্লাহ সবার প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থার খবর রাখেন— সুতরাং কার অন্তরে কী আছে, সে বিচারের মালিক একমাত্র তিনিই।

আয়াত:
اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

বাংলা অনুবাদ:

"(নবী তো তারা,) যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

(সূরা আল-আহযাব: আয়াত ৩৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবীদের (ও তাঁদের পথ অনুসরণকারীদের) এক মহান গুণ তুলে ধরেছেন, যা দাওয়াত ও তাবলীগের অন্যতম মূলনীতি। আল্লাহ বলেন, **"তারা আল্লাহর রিসালাত (বার্তা) প্রচার করত"**— অর্থাৎ তারা নিজের দায়িত্ব ও দায়িত্বশীলতা বুঝে দ্বীনের বার্তা মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করত। তারা কেবল প্রচারক ছিল না, বরং দায়িত্বশীল ও আমানতদার প্রচারক ছিল, যারা একটুও গাফেল হতো না।

এরপর আল্লাহ বলেন, **"তারা আল্লাহকে ভয় করত এবং কাউকে ভয় করত না আল্লাহ ছাড়া।"** এখানে নবীদের সাহসিকতা ও তাওয়াক্কুলের কথা বলা হয়েছে। সমাজ, শত্রু, রাজা-বাদশাহ বা কোনো শক্তির ভয়ে তারা দ্বীনের কথা বলা থেকে বিরত থাকত না। কারণ তারা জানত, **আল্লাহর ভয়ই প্রকৃত ভয়**— যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সকল কল্যাণ ও অকল্যাণ।

এই আয়াত দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক মুসলিমকে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের শিক্ষা দেয়। দাওয়াহ কখনো সহজ হয় না; প্রতিকূলতা, বিরোধিতা ও ভীতি থাকতেই পারে। কিন্তু একজন সৎ দাঈ কখনো মানুষের রোষ বা বিদ্বেষে ভীত হয়ে দ্বীনের সত্য কথা বলায় পিছপা হবে না।

শেষাংশে বলা হয়েছে, **"হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।"** অর্থাৎ মানুষের প্রতিক্রিয়া বা সমালোচনার ভয় না করে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, কর্মফল দিবে একমাত্র আল্লাহ এবং তিনিই যথেষ্ট হিসাবকারী।

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারকদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে— সত্য প্রচারে দৃঢ়তা ও আল্লাহভীতি থাকা আবশ্যক। মানুষ কী বলল, কী করল— তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আল্লাহ কী চান। একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই দাঈর লক্ষ্য হওয়া উচিত। এতে আল্লাহর সাহায্য ও সন্তুষ্টি নিশ্চিত হবে।

আয়াত:

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَا دَةً ۖ قُلِ اللّٰهُ ۖ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُ وْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰ نُ لِاُ نْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ...

বাংলা অনুবাদ:

"বল, (কোনও বিষয়ে) সাক্ষ্য দানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কী? বল, আল্লাহ! (এবং তিনিই) আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি ওহীরূপে এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকেও সতর্ক করি এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকেও। [৭] সত্যিই কি তোমরা এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবুদও আছে? বলে দাও, আমি তো (এরূপ) সাক্ষ্য দেব না। বলে দাও, তিনি তো একই মাবুদ। তোমরা যে সকল জিনিসকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত কর, আমি তাদের থেকে বিমুখ। (সূরা আল-আন'আম: আয়াত ১৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি কুরাইশ মুশরিকদেরকে বলেন— সবচেয়ে বড় সাক্ষী কে? অর্থাৎ আল্লাহই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, সব কথা ও কর্ম অবগত থাকেন। সুতরাং নবীজি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন এবং যে কুরআন তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে, তার সত্যতার ওপর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে, **"এই কুরআন আমার প্রতি ওহি করা হয়েছে, যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যার কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছে, তাকেও সতর্ক করতে পারি।"** এটি দাওয়াহ এবং তাবলীগের একটি মৌলিক ভিত্তি। এখানে নবীজিকে শুধু একটি নির্দিষ্ট কওম বা সম্প্রদায়ের নবী বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে— কুরআন যাদের কাছে পৌঁছবে, তারাও সতর্কবার্তার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বাণী যত মানুষের কাছে পৌঁছবে, তারা সবাই এর দাওয়াতের আওতায় পড়বে।

এরপর আল্লাহ বলেন, **"তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে?"** এই প্রশ্ন মুশরিকদের ভুল আকীদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। আবার নবীজিকে বলা হয়, **"বল, আমি এরূপ সাক্ষ্য দেই না।"** অর্থাৎ তিনি স্পষ্টভাবে শিরক ও বহু-ইলাহ বিশ্বাসের বিরোধিতা করেন।

শেষে নবীজি (সা.)-কে বলা হয়: **"বল, তিনিই একমাত্র উপাস্য, আর আমি তোমাদের শিরকের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না।"** এটা নবীজি (সা.)-এর তাওহীদের প্রতি পূর্ণ ঘোষণা এবং মুশরিকদের থেকে প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতা।

এই আয়াত নবীজি (সা.)-এর নবুওতের সত্যতা, কুরআনের সর্বজনীন দাওয়াত এবং তাওহীদের পরিপূর্ণ আহ্বান স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুধুমাত্র মুখে আহ্বান নয়— বরং স্পষ্টভাবে সত্যের ঘোষণা, শিরক থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং কুরআনের বার্তা প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামে দাওয়াত বা ইসলামের আহ্বান একটি মৌলিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব, যা শুধু নবীগণের কাজ ছিল না— বরং এই দায়িত্ব নবীজির (সা.) উম্মতের উপরও অর্পিত হয়েছে।

আয়াত:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

বাংলা অনুবাদ:

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন— **দাওয়াত ও সমাজ সংস্কার**। এখানে বলা হচ্ছে, মুসলিম সমাজে একটি সচেতন, কার্যকর, ও দায়িত্ববান দল থাকা জরুরি, যারা মানুষকে **ভালো কাজের দিকে ডাকবে**, **সৎকাজের নির্দেশ দেবে** এবং **অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে**।

১. " — "وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ""তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল হোক"

এই অংশে আল্লাহ মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তাদের মধ্য থেকে একটি দল সর্বদা সক্রিয় থাকে, যারা দাওয়াহ ও সমাজ সংস্কারের কাজ করবে। এর মানে এই নয় যে সবাই একসাথে এক কাজ করবে; বরং সমাজের একটি অংশকে এই মহান কাজে উৎসর্গ করতে হবে।

২. " — "يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ""যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানায়"

এই 'কল্যাণ' ((الخير শব্দটি ইসলামের সকল ভাল দিক, যেমন— ঈমান, ইবাদত, ন্যায়বিচার, দয়া, সহানুভূতি ও মানবতার কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত করে। দাওয়াতের উদ্দেশ্য শুধু ইসলাম প্রচার নয়, বরং সমাজে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৩. " — "وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ"সৎকাজের আদেশ দেয়"

এই অংশটি নির্দেশ করে যে শুধু ভালো কথা বলা যথেষ্ট নয়; বরং সমাজে যা ভালো ও গ্রহণযোগ্য (,(معروف যেমন: নামাজ, দান, সততা, ন্যায় বিচার— এসব কাজের জন্য উৎসাহ দেওয়া একটি দায়িত্ব।

৪. " — "وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে"

দাওয়াতের একটি অপরিহার্য দিক হলো সমাজে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা। 'মুনকার' বলতে সেইসব কাজ বোঝানো হয় যা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম, যেমন: মিথ্যা, জুলুম, সুদ, অনাচার ইত্যাদি।

৫. " — "وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ"আর এরাই সফলকাম"

এই অংশে আল্লাহ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতা তাদের জন্য যারা এই দায়িত্ব পালন করে। শুধু নামাজ-রোজা নয়, বরং সমাজের কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়াও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

এই আয়াত মুসলিমদের জন্য একটি সামষ্টিক দায়িত্বের ঘোষণা। এখানে দাওয়াহ ও তাবলীগকে একটি দলীয় বা সংঘবদ্ধ উদ্যোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, ইসলামে একজন দাঈ শুধু উপদেশদাতা নয়— তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও। ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতের ধর্ম নয়; এটি একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, যেখানে সমাজকে ভালো ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করা মুসলমানদের একটি মহান দায়িত্ব।

আয়াত:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّا سِ تَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَا نَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَ كْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

বাংলা অনুবাদ:

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের

অধিকাংশই নাফরমান।
(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১১০)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যাদের আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন। এই আয়াতটি ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলিম উম্মাহর দাওয়াতি দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে।

১. "كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ" – "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত"

এখানে আল্লাহ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন, কারণ মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে এবং সৎকাজের জন্য সংগ্রাম করতে আদিষ্ট। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাপন এবং শিক্ষার মাধ্যমে একে অপরকে ভালো কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২. "اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" – "মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে"

এ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলমানদের এ দায়িত্ব শুধু তাদের নিজেদের জন্য নয়, বরং এটি বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য। মুসলমানদের দায়িত্ব হলো বিশ্বের সবার জন্য ইসলামিক শিক্ষা পৌঁছানো এবং সমাজে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা।

৩. "تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ" – "সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর"

এই অংশটি মুসলমানদের দায়িত্ব বর্ণনা করে— তাদের উচিত সমাজে ভালো কাজের প্রচারণা করা এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। "মাকরূফ" শব্দের অর্থ হলো যে সমস্ত কাজ ইসলাম বা সমাজে ভালো হিসেবে পরিগণিত হয় (যেমন: ন্যায়, সহানুভূতি, দান), আর "মুঙ্কার" শব্দের অর্থ হলো সেই সমস্ত কাজ যা ইসলামে নিষিদ্ধ বা খারাপ হিসেবে বিবেচিত (যেমন: মিথ্যা, চুরি, অবিচার)।

৪. "وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ" – "আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল"

মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের ঈমান— আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আনুগত্য। আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা, তাঁর আদেশ মানা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করা মুসলমানদের মূল বৈশিষ্ট্য।

৫. "وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ" – "যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত"

এ অংশে আহলে কিতাব (যারা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব যেমন, তওরাত, ইঞ্জিল, বা জবূর নিয়ে বিশ্বাস করে) সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ এখানে নির্দেশ করছেন যে,

যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, অর্থাৎ তারা ইসলামের সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করত, তাহলে তাদের জন্য এটি উপকারি হত।

৬. "مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ" – "তাদের মধ্যে কিছু মুমিন এবং তাদের অধিকাংশই ফাসেক"

এখানে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক সত্যিকারের ঈমান আনবে, তবে বেশিরভাগই আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী বা সীমালঙ্ঘনকারী (ফাসেক) থাকবে। এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তাদের জন্য সফলতা থাকবে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী থাকবে তারা আল্লাহর হুকুম থেকে বিচ্যুত থাকবে।

এই আয়াতটি মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং গৌরব বর্ণনা করে। মুসলমানদের দায়িত্ব শুধু তাদের নিজেদের ধর্মীয় জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা মানবজাতির কল্যাণে কাজ করবে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন— সৎকাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান বজায় রাখা। এই দায়িত্ব পালন করে মুসলমানরা সর্বোত্তম জাতি হতে পারে, যা একে অপরের কল্যাণ এবং মানবতার জন্যও উপকারী।

আয়াত:

وَا لْمُؤْمِنُوْنَ وَا لْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

বাংলা অনুবাদ:

মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আত-তাওবাহ: আয়াত ৭১)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীর মধ্যে একে অপরের প্রতি বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং একতার সম্পর্ককে বর্ণনা করেছেন। এটি ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি, যেখানে মুসলিমরা পরস্পরের কল্যাণের জন্য কাজ করেন, সৎকাজের জন্য আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন। এখানে আল্লাহ মু’মিনদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন।

১. "وَا لْمُؤْمِنُوْنَ وَوَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ" – "মু’মিন পুরুষ আর মু’মিন নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু"

এই অংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু এবং তাদের মধ্যে একটি গভীর বন্ধন থাকতে হবে। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি হলো বিশ্বাস, ঈমান এবং ইসলামী মূল্যবোধ। ইসলামে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে বন্ধন এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

২. "يَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" – "তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে"

এখানে মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে— তারা সমাজে সৎকাজের জন্য উৎসাহিত করবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এটি দাওয়াহ এবং তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যেখানে একজন মুসলিম তার প্রতিবেশী বা সমাজের সদস্যদের ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

৩. "وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ" – "নামায ক্বায়েম করে, যাকাত দেয়"

নামায ও যাকাত ইসলামিক জীবনযাত্রার দুটি মৌলিক স্তম্ভ। নামায মুসলিম জীবনের কেন্দ্রীয় ইবাদত, যা আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে, এবং যাকাত সমাজের গরীব ও অসহায়দের সাহায্য করার মাধ্যমে সমাজে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে। এখানে বলা হয়েছে, মু’মিনরা নিয়মিত নামায আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, আত্ম-শুদ্ধি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনকে প্রতিফলিত করে।

৪. "وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ" – "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে"

এখানে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ মানবে। এই আনুগত্য ইসলামের মূল ভিত্তি, যেখানে মুসলমানদের ঈমান, আমল, এবং আচার-আচরণ আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে হবে।

৫. "أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ" – "তাদের জন্য আল্লাহ রহমত পাঠাবেন"

এখানে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে যারা এই বৈশিষ্ট্যগুলো পালন করবে— অর্থাৎ যারা সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে, নামায ও যাকাত আদায় করবে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে— তাদের উপর আল্লাহ বিশেষভাবে রহমত পাঠাবেন।

৬. "اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ" – "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রভু, শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান"

এই অংশে আল্লাহ তাআলা নিজেকে **আযিজ (শক্তিশালী)** এবং **হাকিম (প্রজ্ঞাবান)** হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। আল্লাহর শক্তি এবং প্রজ্ঞা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং তাঁর পক্ষ থেকে যথাযথ পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করা হবে।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীদের একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য দায়িত্ব দিয়েছে, যেখানে তারা একে অপরকে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এটি ইসলামের **দাওয়াত ও তাবলীগ**-এর মূল উদ্দেশ্য, যেখানে মুসলমানরা শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করবে। এছাড়া, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, নামায ও যাকাত আদায়সহ সৎকাজের আদেশ পালন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে এবং পরকালে সফল হবে।

আয়াত:

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

বাংলা অনুবাদ:

(যারা এই সফল সওদা করেছে, তারা কারা? তারা) তাওবাকারী, (আল্লাহর) ইবাদতকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, সওম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা ও অন্যায় কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। (হে নবী!) এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

(সূরা আত-তাওবাহ: আয়াত **১১২**)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন মু'মিনদের গুণাবলি উল্লেখ করেছেন যাঁরা প্রকৃত ঈমানদার এবং সফলতার যোগ্য। তিনি তাঁদেরকে ঈমানদার বলে ঘোষণা করে তাঁদের জন্য সুসংবাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে একে একে নয়টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রত্যেক ঈমানদারের জীবনে থাকা উচিত।

প্রথমত, তারা **তওবাকারী**— অর্থাৎ, যারা সব সময় আল্লাহর কাছে নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, গুনাহ থেকে ফিরে আসে। এরপর তারা **ইবাদতকারী**— সবসময় আল্লাহর বন্দেগিতে ব্যস্ত থাকে। **আল্লাহর প্রশংসাকারী** হিসেবে তারা তাঁর নিয়ামতের

জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। **রোযা পালনকারী** হিসেবে তারা নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আত্মনিয়োগ করে।
পরবর্তীতে উল্লেখ আছে **রুকুকারী ও সেজদাকারী**— অর্থাৎ যারা সালাতে মনোযোগ সহকারে রুকু ও সেজদা করে, সালাতের মধ্যে গভীরতা ও আন্তরিকতা বজায় রাখে। তারা শুধু ব্যক্তিগত ইবাদতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা **সৎকাজের আদেশকারী এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী**— যা দাওয়াহ ও তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর মাধ্যমে তারা সমাজকে সুন্দর ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে।
শেষে বলা হয়েছে, তারা **আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণকারী**— অর্থাৎ তারা হালাল ও হারামের পার্থক্য জানে এবং আল্লাহর আইন ও আদেশ মান্য করে চলে।
এইসব গুণাবলির ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "**তুমি মু'মিনদের সুসংবাদ দাও**"— অর্থাৎ এইসব গুণাবলি যাদের মধ্যে থাকবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে চিরন্তন পুরস্কার, শান্তি ও জান্নাতের সুসংবাদ।

এই আয়াত মুসলমানদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা— কেমন হওয়া উচিত একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের জীবন। শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং সমাজের কল্যাণেও কাজ করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ আয়াত দাওয়াহ ও তাবলীগের দায়িত্ব, ইবাদতের গুরুত্ব, আত্মশুদ্ধি এবং ইসলামী শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
ইসলামে দাওয়াত একটি গুরুতর ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই কাজটি কেবল কথা বলেই শেষ নয়— বরং তা জ্ঞান, হিকমাহ (প্রজ্ঞা), ধৈর্য, সহানুভূতি ও উত্তম আচরণে সম্পন্ন হতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের এই দাওয়াহর জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও কার্যকর পদ্ধতি শিখিয়েছে।

আয়াত:
اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِا لْحِكْمَةِ وَا لْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِا لَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِا لْمُهْتَدِيْنَ

বাংলা অনুবাদ:
তুমি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকবে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনও বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যারা তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের

সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।

— (সূরা আন-নাহল ১৬:১২৫)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং মুসলমানদেরকে দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে:

১. হিকমাহ (জ্ঞান-বুদ্ধি):

প্রথমত, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে **হিকমাহ** বা জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োজন। মুসলমানদের উচিত যে, তাদের কথায় যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করা এবং মানুষকে ইসলামিক বিশ্বাসের সত্যতা বোঝানো। এ থেকে বোঝা যায় যে, দাওয়াতি ব্যক্তি যেন এমনভাবে কথা বলে, যে কারণে শ্রোতা বিশ্বাস করে যে, এটি আল্লাহর সঠিক পথ এবং তার জন্য কল্যাণকর হবে।

২. মাও’ইযাহ হাসানাহ (উত্তম উপদেশ):

দ্বিতীয়ত, দাওয়াতির উচিত সৎ উপদেশ দেওয়া, যা **মাও'ইযাহ হাসানাহ** নামে পরিচিত। এর মানে হলো, দাওয়াতি ব্যক্তির কথাবার্তা এমন হওয়া উচিত যাতে তা উত্তমভাবে ও সরলভাবে শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করে। সৎ ও সুন্দর উপদেশ দেয়া, যা কাউকে আহত না করে বা বিরক্ত না করে, বরং তাকে আল্লাহর পথের দিকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করে।

৩. আহসান পন্থায় বিতর্ক (জাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহসান):

তৃতীয়ত, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, যদি বিতর্ক করতে হয়, তবে তা **অত্যন্ত উত্তম ও শালীনভাবে** করতে হবে। মুসলমানদের উচিত বিতর্ক বা আলোচনা করার সময় সতর্ক থাকা এবং যেন কোন ধরনের তিক্ততা বা অশালীনতা সৃষ্টি না হয়। বিতর্ক বা তর্কের উদ্দেশ্য কখনোই কাউকে ছোট করা বা আক্রমণ করা হওয়া উচিত নয়, বরং উচিত অন্যকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা।

এই আয়াতটি দাওয়াতের কার্যক্রমের জন্য মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। এখানে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে শিখিয়েছেন যে, দাওয়াত কখনোই জোরজবরদস্তি বা অসম্মানজনকভাবে করা উচিত নয়। বরং তা করতে হবে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির মাধ্যমে, যাতে মানুষের হৃদয়ে সত্যের প্রতি

আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে। দাওয়াতের এই পদ্ধতিগুলি মুসলমানদের মধ্যে শান্তি, সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে।

আয়াত:

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا۠ وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا۠ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

বাংলা অনুবাদ:

(হে নবী!) বলে দাও, এই আমার পথ, আমি পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও। আল্লাহ (সব রকম) শিরক থেকে পবিত্র। যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

— (সূরা ইউসুফ ১২:১০৮)

এই আয়াতে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতি পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে তিনটি মূল দিক স্পষ্টভাবে উল্লিখিত:

১. স্পষ্ট পথে দাওয়াত:

এ আয়াতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াত দিচ্ছেন এবং এর জন্য **স্পষ্ট জ্ঞানের** উপর ভিত্তি করে। ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করা এবং সঠিক পথে আহ্বান জানানো সবসময় সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার হতে হবে। কোনরকম সন্দেহ বা বিভ্রান্তি ছাড়াই, যার মাধ্যমে শ্রোতারা সহজে বুঝতে পারে যে, এটি আল্লাহর নির্দেশিত পথ। এটি বুঝানোর জন্য অবশ্যই ইসলামের মর্মবাণী ও প্রমাণ সহকারে কথা বলতে হবে, যাতে একে মিথ্যা বা বিভ্রান্তি মনে না হয়।

২. অনুসরণকারী এবং তাদের অবস্থান:

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমি ও আমার অনুসারীরা" — এটি নির্দেশ করে যে, দাওয়াত শুধু রাসূলের নিজের দায়িত্ব নয়, বরং তাঁর অনুসারী সৎ মানুষদেরও এই পথে আহ্বান জানানো উচিত। প্রত্যেক মুসলমানেরও নিজের জীবনকে ইসলামের আদর্শ অনুসারে পরিচালনা করে, এবং অন্যদের সঠিক পথে আনতে সহায়তা করা উচিত। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম শুধু একজন ব্যক্তির জন্য নয়, এটি একটি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, যারা আল্লাহর পথে নিজেকে ও অন্যদের পরিচালিত করবে।

৩. মুশরিকদের থেকে বিরত থাকা:

এই আয়াতে রাসূল (সাঃ) আরো বলেন, **"আমি কক্ষনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হব না"**। এটা একটি স্পষ্ট ঘোষণা যে, ইসলামে শিরক বা আল্লাহর সাথে অন্য কোন

সত্ত্বাকে শরীক রাখা অগ্রহণযোগ্য। ইসলামের এই মৌলিক ভিত্তি অবিচল থাকতে হবে, এবং দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে এটা প্রচার করা উচিত। মুশরিকদের অনুসরণ বা তাদের মতাদর্শের প্রতি একটিও প্রশংসা বা সমর্থন ইসলামে নেই।
এই আয়াতটি মুসলমানদেরকে সঠিক পথে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়। একে অপরকে সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে হবে, যা পরিস্কার, সৎ, এবং কোন সন্দেহ বা বিভ্রান্তি ছাড়াই হওয়া উচিত। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম একটি সুষ্ঠু, সুস্পষ্ট, এবং দৃঢ় বিশ্বাসের পথ, যার মাধ্যমে মুশরিকদের মতাদর্শ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আয়াত:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَا لِحًا وَّقَا لَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

বাংলা অনুবাদ:
তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন।
— (সূরা ফুস্সিলাত ৪১:৩৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন এক মহৎ কাজকে তুলে ধরেছেন, যা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হিসেবে চিহ্নিত। আয়াতটি মূলত দাওয়াতি কাজের মর্যাদা ও তার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে, এবং এক ব্যক্তি কীভাবে নিজের জীবনকে উত্তম করতে পারে তা স্পষ্ট করে।

১. উত্তম কথার পরিচয়:

আল্লাহ প্রশ্ন করছেন— **"কার কথা সবচেয়ে উত্তম?"** এরপরই উত্তর দিয়ে বলেন— সে ব্যক্তি যার জীবন আল্লাহর দাওয়াতি কাজের সাথে জড়িত। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, আল্লাহর পরিচয় দেয়, তাঁর পথে চলার দাওয়াত দেয়— তার কথাই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। মানুষের ভাষা এবং বক্তব্য অনেক ধরনের হতে পারে, কিন্তু সেই বক্তব্যই আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম, যা মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়।

২. দাওয়াতের সাথে আমলের সম্পর্ক:

এই আয়াতে শুধু দাওয়াতের কথা নয়, বরং **সৎ আমল** বা নেক কাজের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। একজন দাঈ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী তখনই সফল,

যখন সে নিজের কথার সাথে মিল রেখে আমলও করে। তার নিজের চরিত্র, আচার-আচরণ, ও জীবনযাপন যেন তার দাওয়াতের বাস্তব প্রতিফলন হয়। শুধু মুখের দাওয়াত নয়— সে নিজের জীবনেও ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করে।

৩. মুসলিম পরিচয়ের সাহসিক ঘোষণা:

সবশেষে, সেই ব্যক্তি ঘোষণা করে— **"আমি মুসলিম"** অর্থাৎ, আমি আল্লাহর অনুগত বান্দা। এটি শুধু একটি নামধারী পরিচয় নয়, বরং একটি জীবনবোধ, আত্ম-সমর্পণ এবং গর্বের প্রকাশ— যে আমি কুফর, শিরক, অপবিত্রতা, অহঙ্কার, এবং গোনাহের পথ পরিহার করে ইসলামের পথে আছি।

এই আয়াত প্রতিটি মুসলমানের সামনে এক আদর্শ উপস্থাপন করে— দাওয়াতি কাজ করা, নেক আমলে লিপ্ত থাকা এবং ইসলামি পরিচয়ে গর্ববোধ করা। যারা মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজেদের জীবনেও ইসলামের বাস্তব অনুশীলন করে, তাদেরকেই আল্লাহ "সর্বোত্তম কথা বলার অধিকারী" বলেছেন। এটি একদিকে যেমন দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব তুলে ধরে, তেমনি দাঈর ব্যক্তিত্ব ও জীবনচর্যার গুরুত্বও স্পষ্ট করে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভ

আয়াত:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

বাংলা অনুবাদ:

তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া। এই ব্যক্তি নিজের আমল ঠিক রাখে এবং নিজের পরিচয় মুসলিম হিসেবে গর্বের সাথে ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং মানুষ তাকে দুনিয়াতেও সম্মান দেয়।

নিজেকে ও অন্যকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৬)

বাংলা অনুবাদ:

হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিজের পরিবারসহ সবাইকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য। এটি দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক— ঘর থেকে দাওয়াত শুরু করা। নিজে আগে সংশোধন হয়ে, এরপর পরিবার ও সমাজে দাওয়াত ছড়ানো।

সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়

আয়াত:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪)

বাংলা অনুবাদ:

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।

একটি আদর্শ সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি হলো দাওয়াতের এই তিনটি দিক—

১. কল্যাণের দাওয়াত

২. সৎকাজের আদেশ

৩. অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা

এগুলো দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু। এসব ছাড়া সমাজে শান্তি ও ন্যায় আসবে না।

নবীদের উত্তরাধিকার বহন

আয়াত:

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

(সূরা ক্বাফ ৫০:৪৫)

বাংলা অনুবাদ:

হে রাসূল!) তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাক।

এই আয়াত নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে দাওয়াতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, কুরআনই হচ্ছে প্রধান দাওয়াতি মাধ্যম। যারা দাওয়াতের কাজ করে, তারা নবীদের কাজের ধারক এবং বংশধর হিসেবে বিবেচিত।

আত্মা প্রশান্তি লাভ করে

আয়াত:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(সূরা রা'দ ১৩:২৮)

বাংলা অনুবাদ:

এরা সেই সব লোক, যার ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।

দাওয়াতের কাজ আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর নির্দেশ পালনের একটি চমৎকার রূপ। এটি আত্মাকে প্রশান্ত করে এবং অন্তরে শান্তি আনে, কারণ এই কাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

দাওয়াত সম্পর্কিত হাদিস

সামষ্টিকভাবে মুসলমানদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য

ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف يقول يأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بها ويقاتلونهم عليها ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهون عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. কুরআনের এই আয়াতের {তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সৎকাজের উপদেশ

দিবে। ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে নির্দেশ দিবে, তারা যেন একথার স্বাক্ষি দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং এ কথা স্বীকার করবে এবং এ বিশ্বাসের উপর অটল থেকে আল্লার জন্য লড়াই করবে। إلى الله إله হলো সর্বত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। وتنهون عن المنكر অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে) এই আয়াতের ব্যখ্যায় বলেছেন: এখানে মুনকার অর্থাৎ অসৎ কাজ থেকে উদ্দেশ্য হলো, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জঘন্যতম অসৎকাজ।

তাবারানি- ১৫৪৩

দাওয়াতের গুরুত্ব

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا

فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

অর্থ: হযরত আয়শা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ করো, অসৎ কাজ হতে নিষেধ করো, ঐসময়ের পূর্বে যখন তোমরা দুআ করবে আর তা কবুল করা হবে না।

ইবনেমাজাহ -৪০০৪

দাওয়াতী কাজ না করলে দুআ কবুল হবে না

عن عائشة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء فتوضأ ثم خرج فلم يكلم احنا فدنوت من الحجرات سمعته يقول يا أيها الناس ان الله عز و جل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا النصركم

অর্থ, হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রুমে প্রবেশ করলেন, আমি তাঁর চেহারা দেখে অনুভব করলাম কোনো বিষয় তাঁকে পেরেশান করেছে। অতপর তিনি অজু করে বের হলেন, (মসজিদের উদ্দ্যেশ্যে) কারো সাথে কোনো কথা বললেন না। আমি হুজরার নিকটবর্তী হলোাম, অতঃপর আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, হে লোক সকল! আল্লাহ তাখালা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো, আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, ঐ সময়ের পূর্বে তোমরা যখন আমার কাছে দুআ করবে, আর আমি তোমাদের দুআ কবুল করবো না। আমার কাছে তোমরা চাইবে, আমি তোমাদেরকে দান করবো না এবং তেমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে আর আমি তোমাদের সাহায্য করবো না।

মুসনাদে আহমদ -২৫২৫৫

দাওয়াতীকাজ পরিত্যগ করলে আজাব আসবে।

عن حذيفة بن اليمان : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمين بالمعروف والتنهون عن المذكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب

অর্থ: হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঐসভার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় অচিরেই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। এমতবাস্থায় যে তোমরা দোআ করবে কিন্তু দেআ কবুল করা হবে না।

তিরমিজি -২১৬৯

একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : بَلِّغُوا عَني وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন একটি বাক্য হলেও আমার পক্ষ হতে পৌঁছিয়ে দাও। আর বনিইসরাঈল থেকে বর্ণনা করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যা বলে তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

বুখারী- ৩৪৬১

ঈমান ও আমলের দাওয়াত

عن ابن عباس ، رضي الله عنهما يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه علك وندعو الله من وراءنا قال أمركم بأربع وألهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده هكذا ، وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة ، وأن تُؤدُّوا خَمْس مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ ، عَنِ الدُّبَاءِ

والحليم ، والنقير ، والمُزفت "

অর্থ, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আব্দে কায়স" এর প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাবীয়া গোত্রের কুফফারে মুযার, তারা আমাদের ও আপনার সাক্ষাতের মাঝে প্রতিবন্ধক। ফলে আমরা শুধু হারাম মাসেই আপনার একান্ত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে সারগর্ভএমন কিছু বিষয়ের আদেশ করুন, যা আমরা আপনার থেকে গ্রহণ করবো এবং আমাদের অনুপস্থিত লোকদের কাছে তা পৌঁছে দেবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি চারটি বিষয়ের আদেশ করছি এবং চারটি জিনিসের থেকে নিষেধ করছি। (১) আমি আদেশ করছি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আবু হুরায়রা রা. বললেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে হাত বাধলেন। (২) এবং আদেশ করছি নামাজ কায়েম কর। (৩) এবং যাকাত আদায় কর। (৪) এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আদায় কর। আর তোমাদেরকে নিষেধ করছি, (১) কলুর তৈরী পাত্র, (২) মাটির তৈরী পাত্র, যা সবুজ রঙ দ্বারা পালিশকৃত,

(৩) খেজুর গাছের গোড়া দ্বারা তৈরীকৃত পাত্র, (৪) আলকাতরা দ্বারা পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার থেকে, (কারণ এগুলো মদ তৈরীর পাত্র)।
বুখারী-১৩৯৮

অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার লাভ

عن أبي حازم قال : أخبرني سهل ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، يَعْنِي ابْنِ سعد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبر لأعطين الراية هذا رجلا يفتح على يديه يحب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الله ورسوله فيات الناس ليلتهم أيهم يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ اين على قبيل يشتكي عينيه فبصق في عينيهِ وَدَعَا لَهُ فيرا كانلمْ يَكُن بِهِ وَجَعَ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبِرُهُم يما يجب عليهم فوالله لأن يهدي اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ "

অর্থ: সাহলো বিন সাদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে এক দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামী কাল এমন একজন ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা দেবো, যার হাতে বিজয় দান করা হবে। যিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসেন। আবার আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। সব মানুষ অস্থির হয়ে রাত পার করলেন। প্রত্যেকের আশা সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি যেন তিনিই হন।

পরদিন সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হযরত আলী কোথায়? তখন জানানো হলো, তিনি চোখের পীড়ায় ভুগছেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে মুখু মেখে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করে দিলেন। সাথে সাথেই তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তাঁর কোনো ব্যাথাই ছিলো না, অতঃপর তাকে ঝান্ডা দিলেন। তখন হযর আলী রা. বললেন, আমি তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাবো। যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো (মুসলমান) হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ধীরে ধীরে (তাদের এলাকায়) ঢুকে যাও। তাদের আঙ্গিনা পর্যন্ত চলে যাও। তারপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। সাথে সাথে তাদের করণীয় বিষয়গুলো জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম আল্লাহ

তোমার মাধ্যমে কাউকে হেদায়াত পেলে সেটি তোমার জন্য লাল উট লাভ করা থেকে উত্তম।

দায়ী দাওয়াত গ্রহণকারীর আমলের সমপরিমান সওয়াব লাভ করবে

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعة لا ينقص ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا

অর্থ, হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে পাই, তাহলো, ইসলামের দাওয়াতের গুরুত্ব হলো প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে, পরে আমলের দাওয়াত দিতে হবে। চার জিনিস থেকে নিষেধ করলেন কেন?

এগুলো ধারা মদ বানানো হতো, প্রথমেই মদের উৎস গুলো থেকেই বিরত থাকর নিদের্শ দিয়েছেন। এই জন্য রোগ দূর করার আগে রোগের উৎস বের করে উৎসাই নষ্ট করে দেয়া দরকার, তাহলো রোগ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে।
বুখারী -৩০০৯

এই হাদিস থেকে আরো একটি বিষয় শিখতে পাই। তাহলো দাওয়াত ফিকির হলো ওয়াফদে আব্দুল কায়েস হুজুর সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন আমরাদেকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা অনুপস্থিতদেরকে বলতে পারবো। অজ্ঞাত যারা আসতে পারেনি তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব। তারা স্বজাতির ফিকির করেছে। আমাদের উচিৎ আমরা কোনো জিনিস জানলে তা স্বজাতিকে জানিয়ে দিব। হক গোপন করবো না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন

১৪. অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার লাভ

عن أبي حازم قال : أخبرني سهل ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، يَعْنِي ابْنِ سعد قال : قال النبي صلى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيبر الأغطين الراية غدًا رجلاً يفتح على يديه يجب الله ورسوله

ويُحِبُّهُ الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلَى فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ أَبَرًا كَانَ

তোমার মাধ্যমে কাউকে হেদায়াত পেলে সেটি তোমার জন্য লাল উট লাভ করা থেকে উত্তম।

দেখুন ঘটনাটি হলো একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের। আবার সাধারণ কোনো যুদ্ধ নয়, যেই যুদ্ধে সয়ং নবীজী নিজেই উপস্থিত। যুদ্ধটি আবার কোনো মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ নয়। যুদ্ধটি হলো সসস্ত্র যুদ্ধ। সরাসরি কাফেরদের সাথে। যখন সরুর সামনে হাজির হবে। স্বাভাবিক সময়টি হলো রক্ত গরমের, সামনে পেলেই হত্যা করার হুকুম, তারাও একা পেলে ছেড়ে দিবে না। এমন মুহুর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। যদি কেউ মুসলামান হয়ে যায়। তাহলে লাভহলো। লাল উট দানের ছাওয়াব। ঐ সময়ে আরবে সবচে দামী বস্তু ছিল লাল উট। যানবাহনের জন্য খুবই ভালো। বর্তমান যেমন টয়েটা, পাজারো ইত্যাদি। আসুন আমরা এই অমুসলীমদেরকে দাওয়াত দিয়ে এই বিশাল ছাওয়াবের ভাগিদার হয়।

এই হাদিস থেকে আরো একটি বিষয় খুব ভালো ভাবে জানতে পারলাম তাহলো, কারো হাতে একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে লাল উঠ লাভ করা থেকে উত্তম। অর্থাৎ সবচাইতে দামী বস্তুটি অর্জন করা থেকে।

আমরা কি এই বিশাল পুরস্কারটির প্রতি লক্ষ্য করেছি? কত লাভের কথায় শুনি ও আমলকরি। কিন্তু এই মহান লাভের জন্য কি কখনো ফিকির করেছি? কখনও কি আমল করেছি? এছাড়াও আরো একটি লাভ রয়েছে। কারো হাতে যদি একজন অমুসলিম

হেদায়াত তথা (ইসলাম) এর দিকে দাওয়াত দেয়, সে ঐ সমস্ত লোকদের সমপরিমান সওয়াব পাবে, যারা তার দাওয়াতের উপর আমল করেছে। তবে অনুসরণ কারীদের সওয়াবে কোনো ঘাটতি বা কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি খারাপ কজের দিকে দাওয়াত দিবে, তাহলে তার আনুসারীদের সমপরিমান গোহ তার উপর বর্তঅবে। এতে অনুসারণ কারীদের গোনাহ কমবে না।

আগ্রহী শ্রুতার জন্য হেদায়াতের প্রত্যাশা করা যায়

عن معاوية بن أبي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنما انا مبلغ والله يهدي وقاسم والله يعطي فمن بلغه مني شيء بحسن رغبة وحسن هدى فان ذلك الذي يبارك له فيه ومن بلغه عني شيء بسوء رغبة وسوء هدى فذاك الذي يأكل ولا يشبع 28

অর্থ, মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আমি মুবাল্লিাগ। আর আল্লাহ হেদায়াত দান করেন এবং আমি (রাসূল) বণ্টনকারী। আর আল্লাহ দান করেন। যার নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো কিছু আগ্রহ ও সুন্দর নির্দেশনা রুপে পৌঁছাবে, তা হলো ঐ ব্যক্তির জন্য তা বরকতময় হবে। আর যার কাছে আমরার পক্ষ থেকে গুরুত্বহীনতা ও অনর্থক নিদর্শন রুপে পৌঁছবে। তাহলে তা তার জন্য বরকত ময় হবে না। নিশ্চয় উহা যাতে তার জন্য বরকত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আমার থেকে কোনো জিনিসকে খারাপ আগ্রহ ও খারাপ নিদের্শনার পৌঁছবে সুতরাং, উহা এমন যে কোনো ব্যক্তি খাই ঠিকিই কিন্তু তৃপ্ত হয় না। মুসনাদে আহমদ -১৬৯৩৭

সাধ্যনুযায়ী অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করা

عن طارق بن شهاب - وهذا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ أَوَّلَ مَنْ بَدَا بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « مَن رأى منكم ملكرًا فَلْيُغَيْرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فيلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فيقليه وذلك أضعف الإيمان .

অর্থ, হযরত তারেক ইবনে শিহাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি ঈদের দিন নামাজের পূর্বে খুতবা দিয়েছে, সে হলো মারওয়ান। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল। ঈদের নামাজ হবে। খুতবার পূর্বে। তখন মারওয়ান বলল: ওটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তখন হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. বললেন: এই ব্যক্তি তার দায়িত্ব আদায় করেছে। আমি রাসূলূল্লাহ কে বলতে তিনি বলেন শুনেছি তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অসৎকাজ দেখবে, সে যেন নিজ হাত দ্বারা প্রতিহত করে যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে নিজ যবান দ্বারা (অসৎকজের প্রতিবাদ জানাবে)। যদি তাও তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তরে তা ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের সর্ব নিম্নস্তর।
ইবনে মাজাহ – ৪০১৩

নবী (স.) এর দাওয়াত ও তাবলীগ

এ পৃথিবীর ইতিহাসে বহু সাধু, গুরু, সন্যাসী ও গোত্রপ্রধানেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের ভক্তি-বিশ্বাসকে বলি দিয়েছে। যুগে যুগে বিবেক-বুদ্ধির পূজারী সমাজের কর্তাব্যক্তিরা মানুষের সরলতার সুযোগে কত যে মতবাদ আবিষ্কার করেছে, তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই।

কেউ মানুষকে বলেছে, ভোগবাদেই শান্তি। কেউ বলেছে, বৈরাগ্যেই মুক্তি। কেউ পূর্বপুরুষদের সমাধি, প্রতিমা, ভাস্কর্য আর কেউ আকাশের চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রকে খোদা সাব্যস্ত করেছে। কেউ তো নিজেই খোদা দাবি করেছে। কেউ বলেছে খোদা তিনজন। আর কারো হিসাব মতে খোদার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটি। কেউ প্রচার করেছে, খোদা বা পরকাল বলে কিছু নেই। এ দুনিয়াই সব। আসল হচ্ছে বুদ্ধির মুক্তি, আত্মার বিকাশ আর মানবকল্যাণ। কেউ মানুষের সীমাবদ্ধ বিবেককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালত বলে খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। আর কেউ বিবেকের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে নিজেদের মনগড়া কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরেছে। কেউ ঘোষণা করেছে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর কেউ বলেছে, সরকারই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক।
ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, স্বার্থান্বেষী লোকেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পূর্বের আসমানী কিতাবে বারংবার হস্তক্ষেপ চালিয়েছে। ক্ষমতাসীনেরাও দফায় দফায় বৈঠক করে সেসব কিতাবে একাধিক সংশোধনী এনেছে। কেউ তো ঐক্য-সম্প্রীতির দোহাই দিয়ে এক খোদা ও বহু খোদার ধর্মের মিশেলে সম্পূর্ণ নতুন মত প্রবর্তন করতেও ছাড়েনি। আর একদল হতভাগ্য মানুষ সবকিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে। শিশু যেমন কাগজের টুকরো নিয়ে বিচিত্র খেলা করে। কখনো দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। কখনো মেলে ধরে। কখনো খোলে আবার বন্ধ করে। আর যখন ইচ্ছে হয় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আনন্দ লাভ করে। তেমনি এরাও মানবতার ভক্তি, বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে এরূপ নির্মম ছিনিমিনি খেলেছে এবং নামে বেনামে আজো খেলে চলেছে।

নববী দাওয়াতের স্বরূপ

পৃথিবীর শুরু থেকেই মানুষ এক অভিন্ন দ্বীনের অনুসারী ছিল। মানুষকে আল্লাহ তাআলা সীরাতুল মুসতাকীমের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রথম থেকেই নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদেরকে প্রেরণ করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে সকল দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা। আল্লাহপ্রদত্ত ঐশী শিক্ষার দাওয়াত দেয়া। মানুষের যাবতীয় দ্ব›েদ্বর অবসান ঘটানো এবং অসভ্যতার অন্ধকার থেকে তাদেরকে ঈমানের আলোকিত পথে বের করে আনা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.

(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন। যারা (সত্যপন্থীদের) সুসংবাদ শোনাত এবং (মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করত। আর তাঁদের সঙ্গে সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করলেন। যাতে তাঁরা মানুষের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়। -সূরা বাকারা (২) : ২১৩.

কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো যুগেই তাঁদের দাওয়াতী কর্মের ফল একপর্যায়ের ছিল না। জগতের চিরন্তন নীতি অনুযায়ী কিছু মানুষ তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন আর অনেকে দেয়নি। বরং প্রত্যেক যুগেই সমাজের সম্পদশালী ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নবীগণকে অবজ্ঞা-অপমান করেছে। [দ্র. সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ৩০; সূরা নাহল (১৬) : ৩৬; সূরা যুখরুফ (৪৩) : ৭]

নবীগণের দায়িত্ব ছিল কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া। [দ্র. সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ১৭; সূরা নাহল (১৬) : ৩৫; সূরা শুআরা (২৬) : ৪৮]

আর তাই জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে না। [দ্র. সূরা বাকারা (২) : ১১৯.]

আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে সকল মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু এটা আল্লাহর নীতি নয়। [সূরা হুদ (১১) : ১১৮-১১৯]

মানুষকে তিনি চোখ, কান, বিবেক, বুদ্ধি দিয়েছেন। হকের দাওয়াত তার কাছে পৌঁছিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা তাকে দান করেছেন। [দ্র. সূরা বালাদ (৯০) : ৮-১০; কাহাফ (১৮) : ২৯]

এজন্য যুগে যুগে যারাই নবীগণের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে নাজাত দান করেছেন। আর যারা অস্বীকার করেছে, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। [দ্র. সূরা নাহল (১৬) : ৩৬; সূরা আনআম (৭) : ৪২-৪৪; সূরা ইউসুফ (১২) : ১০৯-১১০]

আল্লাহ তাআলা পূর্বের নবীগণকে নির্দিষ্ট জনপদ বা গোত্রের বাসিন্দাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। [দ্র. সূরা ফাতির (৩৫) : ২৪]

সকল উম্মতের মাঝেই কোনো না কোনো রাসূল বা তাঁর প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছেন। [দ্র. সূরা নাহল (১৬) : ৩৬] তবে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের জন্য। [দ্র. সূরা সাবা (৩৪) : ২৮; সূরা আরাফ (৭) : ১৫৮]

এজন্য দাওয়াতী কাজের এ মহান দায়িত্ব শেষনবীর উম্মতকেও প্রদান করা হয়েছে। যেন কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতের হাওয়া চালু থাকে। আর এ কারণেই এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। [দ্র. সূরা আলে ইমরান (৩) : ১০৪, ১১০]

সকল রাসূলের প্রতি আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের বাণীরূপে কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাঁদের সমর্থনে মু'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শনও দান করেছেন। যেন তাঁদের মাধ্যমে অফুরন্ত কল্যাণ ও হেদায়েতের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে যায় এবং যেন আলো-অন্ধকারের স্পষ্ট পার্থক্যরেখা তারা বুঝতে সক্ষম হয়। [দ্র. সূরা রূম (৩০) : ৪৭; সূরা বাকারা(২) : ২১৩; সূরা ইবরাহীম (১৪) : ১]

নবীগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তু

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তু মৌলিকভাবে দুটি। এক. ঈমান। দুই. আমল। অন্যভাবে বললে এক হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস। দুই. শরীয়তের পালনীয় বিধি-বিধান। চলুন আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের বিষয়স্তু সম্পর্কে 'আলোচনা' করা যাক। এখানে সংক্ষেপে ছয়টি বিষয় সম্পর্কে কথা বলব।

এক. আকীদা-বিশ্বাস

নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে, তন্মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস। এ আকীদা মানুষকে তার রবের সঙ্গে পরিচিত

করে। রবের সাথে তার সম্পর্কের সঠিক পথ দেখায়। তাকে সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে। আকীদার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সঠিক কর্মপন্থা জানতে সক্ষম হয়। এককথায় মানুষের সঠিক কর্মপন্থা, প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য আকীদার উপর নির্ভরশীল।

নবীগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে আমরা প্রধানত তিন ধরনের আকীদার উল্লেখ দেখতে পাই।

১. সকল নবী-রাসূল মানুষকে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাওহীদের এ বাণী আল্লাহ তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ওহীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি অবশ্যই এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব, আমার ইবাদত কর। -সূরা আম্বিয়া (২১) : ২৫

২. নবী রাসূলগণ উম্মতকে স্বীয় রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত, বিশ্বস্ত। তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদবাহী। জাহান্নামের সতর্ককারী। একমাত্র তাঁদের অনুসরণের মাঝেই মানুষের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত। এ মহান বিশ্বাসের প্রতি তাঁরা উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন, আমাদের প্রিয়নবীকে আল্লাহ তাআলা একথা ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন যে, (তরজমা) 'আমি তোমাদের জন্য তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।' -সূরা হুদ (১১) ২

হযরত নূহ আ. নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, (তরজমা) 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।' -সূরা নূহ (৭১) : ২

হযরত মূসা ও হারূন আ.-কে আল্লাহ আদেশ করে বলেছেন,

(তরজমা) 'অতএব, তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল।' -সূরা শুআরা (২৬) : ১৬

এমনিভাবে হযরত হুদ, সালেহ, লূত ও শুআইব আ. নিজ নিজ উম্মতকে এ দাওয়াত দিয়েছিলেন যে-

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوْنِ.

আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনগত্য কর। -সূরা শুআরা (২৬) : ১২৫-১২৬

৩. নবীগণ মানুষকে পরকালের বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, ভালো-মন্দ কর্মের হিসাব, আমলনামা পরিমাপকরণ, বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবস এবং আখেরাতের কঠিন আযাবের ব্যাপারে তাঁরা উম্মতকে সতর্ক করে গিয়েছেন। যেমন, হযরত হুদ আ. নিজ উম্মতকে বলেছেন, (তরজমা) 'আমি তো তোমাদের ব্যাপারে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি।' -সূরা শুআরা (২৬) : ১৩৫

হযরত নূহ আ.-কে আল্লাহ তাআলা আদেশ করে বলেছেন, (তরজমা) 'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে।' -সূরা নূহ (৭১) : ১

আমাদের প্রিয় নবীজির প্রতি আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, (তরজমা) 'আপনি বলুন, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়গুলিতে তিনি জীবন দান করবেন, যিনি তাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সর্বপ্রকার সৃজন জানেন।' -সূরা ইয়াসীন (৩৬) : ৭৯.

এছাড়া আকীদার অন্যান্য শাখা যেমন, ফিরিশতা, আসমানী কিতাব ও ভালো-মন্দের তাকদীরে বিশ্বাসের প্রতিও নবীগণ মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন।

দুই. ইবাদত

আকীদার পর দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইবাদত। সকল নবী রাসূলের দাওয়াতে এ বিষয়ে অপরিসীম তাকিদ করা হয়েছে। মানবজাতির সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আমি জিন ও মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬

ইবাদত অর্থ আল্লাহর উপাসনা।

যেমন, নামায, রোযা, হজ¦, যাকাত, যিকির, তিলাওয়াত, ই'তিকাফ, কুরবানী ইত্যাদি। সকল নবী-রাসূল নিজ উম্মতকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন। [দ্র. সূরা আম্বিয়া (২১) : ২৫]

পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের বিবরণীতে বিভিন্ন ইবাদতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহর নবী হযরত ইসমাঈল আ. নিজ পরিবার-

পরিজনকে নামায ও যাকাতের আদেশ করতেন। [দ্র. সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৫] হযরত ঈসা আ. মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় কুদরতীভাবে যেসব কথা বলেছিলেন, তন্মধ্যে একটি বাক্য ছিল, (তরজমা) 'আর আমাকে আল্লাহ নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি।' [সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩১] হযরত ইবরাহীম আ.-কে আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়ে বলেছেন, (তরজমা) 'আর মানুষের মধ্যে হজে¦র ঘোষণা করে দাও।' [হজ¦ (২২) : ২৭] আর পশু কুরবানী আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের উপর নির্ধারণ করেছিলেন। [দ্র. সূরা হজ¦ (২২) : ৩৪] এমনিভাবে রোযা, জিহাদও পূর্বের নবীগণের যুগে ফরয ছিল। [দ্র. সূরা বাকারা (২) : ১৮৩, ২৪৬] হযরত দাউদ আ. সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। [দ্র. সূরা ছ¦াদ (৩৮) : ১৮]

তিন. মুআমালা বা লেনদেন

কিছু মুসলমান দ্বীন বলতে কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর ইবাদতকেই বোঝে। হাট-বাজারে, আয়-রোযগারে দ্বীনের যেন কোনো প্রয়োজনই নেই। মূলত দ্বীনী শিক্ষার অভাব আর দেশে দেশে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটই এ ধারণা সৃষ্টির কারণ। অথচ মুআমালা-লেনদেন হচ্ছে ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। ইসলামে এবং পূর্বের নবীগণের দাওয়াতেও এ বিষয়ে পরিষ্কার বিধি-নিষেধ রয়েছে। স্বয়ং আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সচেতন ও আদর্শ ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যাপকভাবে সাহাবায়ে কেরামের পেশাও ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পৃথিবীব্যাপী বিগত দেড় হাজার বছরের মুসলিম শাসনামলেও ইসলামী অর্থনীতি সফলভাবে কার্যকর ছিল।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ব্যবসায়ী মুসলমানদের মাধ্যমেই ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহয় লেনদেন বিষয়ক অসংখ্য নির্দেশনা বিদ্যমান।

আল্লাহর নবী হযরত মূসা আ.-এর যুগে কারূন নামে এক ধনকুবের ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার মাধ্যমে তাকে অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা জানিয়েছিলেন। যা ইসলামী নীতিমালার অংশ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ ابْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ.

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তার মাঝে তুমি আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর।'

অর্থাৎ এ অর্থ-সম্পদের তুমি একচ্ছত্র মালিক নও। এসব আল্লাহর দান। অতএব, সম্পদকে তুমি আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম বানাবে এবং আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত যাবতীয় হালাল-হারামের নীতি মেনে চলবে।

وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.

'কিন্তু তুমি তোমার দুনিয়ার অংশের কথা ভুলে যেও না।'

অর্থাৎ, দুনিয়াতে তোমার যেটুকু প্রয়োজন, তার কথাও স্মরণে রেখো। হালাল পন্থায় আয় কর। আর নিজের বৈধ প্রয়োজনে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় কর।

وَ اَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ.

'আল্লাহ তোমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও অন্যদের প্রতি অনুগ্রহ কর।'

অর্থাৎ তোমার সম্পদ যেহেতু আল্লাহর দান, সুতরাং তুমিও আল্লাহর পথে মানুষকে দান কর। যাকাত আদায় কর।

وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ.

'পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।' -সূরা কাসাস (২৮) : ৭৭

অর্থাৎ, সম্পদের অহমিকায় পড়ে অন্যদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ শুরু করে দিও না। মানুষের অধিকার কেড়ে নিও না।

কিন্তু কারূন হযরত মূসা আ.-এর এ দাওয়াতকে অহংকারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। পরিণামে আল্লাহ তাকে ও তার সম্পদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেন। [দ্র. সূরা কাসাস (২৮) : ৭৮-৮১] এমনিভাবে হযরত শুআইব আ. যখন তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা মানুষের বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্যে ওজনে কম দিও না। তখন তারাও নবীর দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে বরং বিদ্রæপ করে বলেছিল- (তরজমা) হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত, আমরা তাদের বর্জন করি অথবা আমরা আমাদের ধন-সম্পদে আমাদের যা ইচ্ছা, তা করা ত্যাগ করি? তুমি তো বড়ই সহনশীল ভালো মানুষ! -সূরা হুদ (১১) : ৮৭

পরিণামে তাদের প্রতিও আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়েছিল। [দ্র. সূরা হুদ (১১) : ৯৪-৯৫]

চার. মুআশারা তথা সামাজিক কর্তব্য ও অধিকার

কেবল লেনদেনই নয়, সমাজব্যবস্থার সর্বত্র মানুষের কর্তব্য ও অধিকার নিশ্চিত করে একটি সুন্দর সমাজ গঠনেও নববী দাওয়াতের কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই। তবুও একটি ছোট্ট তালিকা লক্ষ্য করুন।

যে কোনো সমাজের প্রথম পরিসর হচ্ছে পরিবার। পরিবারে বাবা-মা'র সঙ্গে সন্তানের আচরণ কীরূপ হবে, মা-বাবার সবল ও দুর্বল অবস্থায়, জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে কী কী হক রয়েছে সন্তানের উপর, তাঁদের খেদমত ও আনুগত্যের পর্যায়, ধরণ ও সীমারেখা কী,

তেমনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মা-বাবার কর্তব্য কী, সন্তানের লালন-পালন, খাদ্য-পোষাক, আনন্দ-বিনোদন, পঠন-পাঠন এবং চরিত্র ও মানস গঠনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কী কী করণীয় বর্জনীয় এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে, এসবই নববী দাওয়াতের বিষয়বস্তু।

সন্তান বড় হলে বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, বিয়ের আয়োজন, বিয়ে পরবর্তী জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ, পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও এলাকাবাসীর হক, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত মুসলমান, মেহমান ও রাস্তায় চলাচলকারী ব্যক্তির হক, কর্তার উপর কর্মচারীর হক, কর্মচারীর উপর কর্তার হক, সরকারের উপর জনগণের হক, জনগণের উপর সরকারের হক, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের হক, মানুষকে ঈমান, আমল ও হেদায়াতের পথ প্রদর্শনকারী দ্বীনী ব্যক্তিবর্গের হক, ছোটদের উপর বড়দের হক, বড়দের উপর ছোটদের হক, গাছপালা, পশুপাখি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও আবহাওয়ার সুরক্ষা ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতিটি বিষয়ই নববী আদর্শ ও শিক্ষার অধীন।

মহান আল্লাহর কুরআন, প্রিয়নবীজীর সুন্নাহ এবং এতদুভয়ের আলোকে উম্মাহ্র বরেণ্য ইমামগণ কর্তৃক সংকলিত ইসলামী ফিকহ তথা আইনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এসব নির্দেশনা, নীতিমালা ও কার্যবিধি যথাযথ সংরক্ষিত আছে। শুধু লিখিত আকারেই নয়, নবীযুগ থেকে আজ অবধি প্রতি যুগের দ্বীনদার মুসলমানগণ এর উপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমলও করে আসছেন।

অথচ দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এক শ্রেণির মুসলমান এরূপ অস্পষ্ট ধারণার শিকার যে, শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, নামায পড়া আর সত্য কথা বলাই যথেষ্ট। সমাজ-জীবনে ধর্মপালনের তেমন কিছু নেই।

পাঁচ. সিয়াসত তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা

যে কোনো সভ্য সমাজেরই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন হচ্ছে তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সরকার, প্রশাসন, আইন, প্রতিরক্ষা, বিচার ও আদালতের অবস্থিতি ছাড়া কোনো সমাজব্যবস্থাই পূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রটিও নবীগণের দাওয়াতের আওতাভুক্ত। রাষ্ট্রব্যবস্থাপনাতেও নববী দাওয়াতের তাত্তি¡ক ও ব্যবহারিক উভয় রকম নির্দেশনা বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন যেন মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। [দ্র. সূরা হাদীদ (৫৭) : ২৫] আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন-

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন, যেন তোমরা আমানতসমূহ তার পাওনাদারদের পৌঁছে দাও। আর যখন লোকদের মাঝে বিচার কর তখন ইনসাফের সাথে বিচার কর। -সূরা নিসা (৪) : ৫৮

আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ করেছেন যে, (তরজমা) (হে নবী!) আপনি বলুন,... আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে। -সূরা শুরা (৪২) : ১৫

আজকাল যারা মুসলিম হওয়া সত্তে¡ও এ কথা বলে বেড়ায় যে, ‘ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। রাজনীতির মধ্যে ধর্মের কোনো স্থান নেই। ধর্ম হচ্ছে কিছু ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠান। অতএব, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ধর্মীয় মহলের মাথা গলানো উচিত নয়।’ এরূপ লোকদের উচিত, সবার আগে নিজের ঈমানের খবর নেয়া।

কারণ, পবিত্র কুরআনে অন্তত চারজন বিশিষ্ট নবীর রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন, হযরত ইউসুফ আ., হযরত দাঊদ আ., হযরত সুলাইমান আ. এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত ইউসুফ আ. ছিলেন মিসরের অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থাপক। [দ্র. সূরা ইউসুফ (১২) : ৫৫, ৫৬, ১০১] গোটা রাজ্যের চরম দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর অর্থনৈতিক সুষম ব্যবস্থাপনার কথা সূরা ইউসুফে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত দাউদ আ. ছিলেন এক শক্তিশালী রাজ্যের অধিপতি। জনসাধারণের মামলা-মোকাদ্দমা মীমাংসার অঙ্গনে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার কথা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। [দ্র. সূরা ছা্দ (৩৮) : ২০]

হযরত সুলাইমান আ. ছিলেন নবুওত ও রাজ্যক্ষমতায় তাঁর পিতা দাউদ আ.-এর উত্তরাধিকারী। [দ্র. সূরা নামল (২৭) : ১৬] তাঁকে আল্লাহ তাআলা এমন রাজত্ব দান করেছিলেন, যা ইতিহাসে আর কাউকে দেয়া হয়নি। [দ্র. সূরা ছা্দ (৩৮) : ৩৫] মানুষ, জিন, পশুপাখি, বাতাস সবকিছুকেই তাঁর অধীন করে দেয়া হয়েছিল। [দ্র. সূরা ছা্দ (৩৮) : ৩৬-৩৭; সূরা নামল (২৭) : ১৭]

আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রব্যবস্থার সবকিছুই তো পবিত্র কুরআন কেন্দ্রিক। নবীজীর বদর, উহুদ, খন্দক ও হুদায়বিয়ার অভিযানগুলোর কথা কুরআনে কারীমে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। কুরআনের অন্তত কয়েক শ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অবকাঠামো, মূলনীতি ও রূপরেখা বিশদাকারে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়নবীকে আদেশ করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

আর আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সেগুলোর (বিষয়বস্তুর) সংরক্ষকরূপে। অতএব, আপনি তাদের মধ্যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফায়সালা করুন। -সূরা মায়েদা (৫) : ৪৮

আমাদের সমাজের যেসব মানুষ এটা মনে করেন যে, নবীগণের দাওয়াতের সঙ্গে রাষ্ট্র, আইন, আদালত ও বিচারব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত। তাদের এটা জানা উচিত যে, পূর্বের নবীগণ আসমানী কিতাবের আলোকে মানুষের মাঝে বিচারকার্য করতেন। [দেখুন, সূরা মায়েদা (৫) : ১৪৬] আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে শাসন করে না, তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক। [দ্র. সূরা মায়েদা (৫) : ৪৪, ৪৫, ৪৭]

ছয়. উত্তম আখলাক

নববী দাওয়াতের আরেকটি বিষয়বস্তু হচ্ছে আখলাক। অর্থাৎ, সুন্দর স্বভাব ও আচরণ। নবী রাসূলগণ নিজেরা যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকের অধিকারী ছিলেন, তেমনি মানুষকেও তাঁরা সেদিকে আহŸান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে বলেছেন-

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

আর নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। -সূরা কলম (৬৮) : ৪

এছাড়া অন্যান্য নবীগণের ব্যাপারেও সৎ, পুণ্যবান, অনুগত, ধৈর্যশীল, পবিত্র এবং অতি সত্যবাদীর মতো অসংখ্য চারিত্রিক গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে। নবী রাসূলগণ মানুষকেও আল্লাহর নির্দেশমতো উত্তম আখলাকের তালীম দিয়েছেন। বরং নবীগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল এটি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

যেমন আমি তোমাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তোমাদের পবিত্র করেন, তোমাদের কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না। -সূরা বাকারা (২) : ১৫১

এ আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত রাসূলের চারটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এক. আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা। দুই. মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। তিন ও চার. কিতাব ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেয়া।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল দ্বিতীয়টি। ‘মানুষকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ তাদেরকে এমন বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা, যাতে তাদের স্বভাব-আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলি অপবিত্র ভাবাবেগ ও অনুচিত চাহিদামুক্ত হয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যমÐিত হয়ে ওঠে।

বলাবাহুল্য, এটাই সেই উত্তম আখলাকের দাওয়াত, যা নবীগণের অন্যতম মহান দায়িত্ব। এ আয়াত থেকে উত্তম আখলাকের সীমাহীন গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। আর এও জানা গেছে যে, নববী দাওয়াতে উত্তম আখলাকের পরিধি অনেক বিস্তৃত। নিছক সৌজন্যের ব্যবহার আর কৃত্রিম ভদ্রতাকে নববী দাওয়াতে ‘উত্তম আখলাক’ বলে না। এখানে উত্তম আখলাক শুরু হয় পরিচ্ছন্ন অন্তর থেকে। সমাপ্ত হয় বহিরাঙ্গের যথাযথ

ব্যবহারের মাধ্যমে। এমনিভাবে নববী উত্তম আখলাক কেবল পুঁথিগত বিদ্যা পড়ে অর্জিত হয় না। কামেল ব্যক্তিগণের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণরূপে হাসিল হয়। হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ حُسْنَ الأَخْلَاقِ.

আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা প্রদানের জন্য। -মুয়াত্তা মালেক, হাদীস ২৬৩৩, ১৮৮৫, ৬৫১; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৮৯৪৯; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ২০৭৮২

উপসংহার

আমরা এতক্ষণ নবী রাসূলগণের দাওয়াতের স্বরূপ ও বিষয়বস্তুসমূহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভের চেষ্টা করেছি। বস্তুত নবী রাসূলগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তু এতই ব্যাপক আর বিস্তৃত যে, কোনো ছোট্ট প্রবন্ধ বা এক-দুটি গ্রন্থে তার যথাযথ আলোচনা সম্ভব নয়।

আকীদা, ইবাদত, মুআমালা-লেনদেন, মুআশারা-সামাজিক কর্তব্য ও অধিকার, সিয়াসাত-রাজনীতি, উত্তম আখলাক-শিষ্টাচার এ ছয় বিষয়ের প্রত্যেকটিই এমন, যার উপর উম্মাহ্র দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে শত-সহস্র গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। সকল যুগের মুসলিম মনীষীগণ এ সবগুলো বিষয়ে মানুষের জন্য যুগোপযোগী কর্মপন্থা রেখে গিয়েছেন। সকল শাখা-প্রশাখাসহ এ বিষয়গুলোর সমষ্টিকেই বলে দ্বীন ও শরীয়ত।

এগুলোর কোনো একটি ছাড়াও দ্বীনের সংজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করবে না। তবে ছয় বিষয়ের মধ্যে প্রধান ও মূল ভিত্তি হল আকীদা-বিশ্বাস। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অবশিষ্ট পাঁচ বিষয়ের সকল নীতি ও বিধানের মধ্যে আকীদার রং ও ঝলক বিদ্যমান। কারো আকীদা-বিশ্বাস যদি ঈমানদারের আকিদা-বিশ্বাস না হয়, তবে আল্লাহর কাছে তার ইবাদত, মুআমালা, মুআশারা, সিয়াসত ও উত্তম আখলাকের কানাকড়ি মূল্যও নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ.

আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আল্লাহ কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ‘পবিত্র বাক্যের’? (অর্থাৎ কালেমা তাওহীদ ও ঈমান সম্পর্কিত কথার) (তার দৃষ্টান্ত এমন,) যেমন

উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার শিকড় (যমিনে) প্রোথিত, আর তার শাখাগুলি আসমানে (বিস্তৃত।) - সূরা ইবরাহীম (১৪) : ২৪

মূলত ঈমান হচ্ছে সেই শিকড়। আর বাকি সব তার ডালপালা। নবী-রাসূলগণ মানুষের অন্তরে সর্বপ্রথম ঈমান নামের এ আসমানী বৃক্ষ রোপনের মেহনত করেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সেই গাছে অন্যান্য শাখা-প্রশাখা যুগিয়েছেন। তবেই তা কাঙ্খিক্ষত ফল দান করেছে।

সকল নবী-রাসূল অভিন্ন আকীদারই দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁদের অনেক ইবাদতও এক ছিল। তবে শরীয়তের কিছু কিছু শাখাগত বিষয়ে যুগ, কাল ও অবস্থার প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলা ভিন্ন বিধান দান করেছেন। [দ্র. সূরা মায়েদা (৫) : ৪৮]

গোপনে ইসলাম প্রচার

দ্বিন প্রচারের নির্দেশ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি গোপনে দাওয়াত দেন এবং একান্ত আপনজন ও আস্থাশীল মানুষদের ইসলামের পথে আহ্বান করেন। তিন বছর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াত প্রদান চলতে থাকে। এ সময় বেশ কিছু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সিরাত গবেষকরা এ সময়কে দ্বিন প্রচারের প্রস্তুতিকাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ তিন বছর সাহাবিদের অনাগত দিনের জন্য প্রস্তুত করেন, তাদের নানাভাবে সংঘবদ্ধ করেন। নবুয়তের প্রথম এ বছরগুলোতে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস, ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়। এ সময় অবতীর্ণ কোরআনের আয়াতগুলোতে দ্বিন প্রচারে পূর্ববর্তীদের ত্যাগ ও সংগ্রামের কথার প্রাধান্য দেখা যায়।

যেন মুসলিমরা আগামী দিনের বাধা-বিপত্তি মোকাবেলায় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে এবং বৈরী পরিবেশে ধৈর্য ধারণ করে। (সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ২৬; আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ৯২)

গোপনে ইসলাম প্রচারের সময় মুসলিমদের নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন তারা সকালে দুই রাকাত ও সন্ধ্যায় দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এ নামাজ ফরজ ছিল কি না সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না।

তবে প্রথম যুগে আদায় করা নামাজ অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অংশ এবং নামাজের চূড়ান্ত নির্দেশনার অংশ ছিল না। কেননা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিরাজের রাতে ফরজ হয়। নামাজের সময় হলে নবীজি (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম পাহাড়ি এলাকায় চলে যেতেন এবং সেখানে নামাজ আদায় শেষে ফিরে আসতেন। (আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ৯১)

আল্লামা ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, 'সাহাবিরা বিভিন্ন পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে নামাজ আদায় করতেন। একবার সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-সহ একদল সাহাবি মক্কার কোনো এক পাহাড়ে নামাজ আদায় করছিলেন এবং মুশরিকদের একটি দল তা দেখে ফেলে।

তারা মুসলিমদের গালমন্দ করে, মুসলিমদের প্রহার করে। সাআদ (রা.) সেদিন একজন মুশরিকের মুখে আঘাত করেন। এতে সে আহত হয়, এটাই ইসলামের জন্য প্রথম রক্তপাত।' এরপর মহানবী (সা.) নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সাহাবিদের দ্বিনি শিক্ষা ও নামাজ আদায়ের জন্য আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়ি নির্ধারণ করেন। (ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা ৯৫)

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু হওয়ার পরও নবীজি (সা.) দারুল আরকামে মুসলিমদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হতেন। কোনো ঐতিহাসিকের মতে, নবুয়তের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বছরে ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্রটি চালু ছিল। (আর-রাসুল, পৃষ্ঠা ৫৯)

গোপনে ইসলাম প্রচারে কোরাইশদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইমাম গাজালি (রহ.) লেখেন, 'কোরাইশরা মুসলিমদের তৎপরতার খবর পাচ্ছিল। কিন্তু তারা এর প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়নি। সম্ভত তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে এমন কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মনে করেছিল, যারা বৈরাগ্যবাদ, সংসার বিরাগী হওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা বলে থাকেন। আরব সমাজে এ ধরনে লোক ছিল। যেমন উমাইয়া ইবনে আবু সালত, কুস ইবনে সা'দা, আমর ইবনে তোফায়েল প্রমুখ। তবে কোরাইশরা এটা লক্ষ্য করেছিল যে তাঁর তৎপরতার যেন একটু বেশি এবং ভিন্ন ধরনের। সময়ের গতিধারার সঙ্গে সঙ্গে কোরাইশরা প্রিয় নবীর ধর্মীয় তৎপরতা এবং দ্বিনপ্রচারের প্রতি ক্রমেই মনোযোগী হচ্ছিল এবং দৃষ্টিপাত করছিল।' (ফিকহুস সিরাত, পৃষ্ঠা ৭৬)

প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ

ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মুমিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হলো এবং রিসালাতের বোঝা বহনের মতো যোগ্যতা অর্জিত হলো ও ইসলাম তার নিজ অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো তখন রাসূলুল্লাহ ((ﷺপ্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও বাতিল দীন, উপাস্যদেরকে উত্তম পন্থায় প্রতিহত করতে আদিষ্ট হলেন।

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়:

(وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) [الشعراء:214]،

''আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।' (আশ-শু'আরা ২৬ : ২১৪)

এটি হচ্ছে সূরাহ শু'আরার আয়াত এবং এ সূরাহয় সর্ব প্রথমে মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তের প্রারম্ভিক কাল কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, বনি ইসরাঈলসহ কিভাবে তিনি হিজরত করে ফেরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন এবং পরিশেষে কিভাবে স্বদলবলে ফেরাউনকে নিমজ্জিত করা হল সেব কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায়, ফেরাউন এবং তাঁর কওমকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতে গিয়ে মূসা (আঃ)-কে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল এ ছিল সেই কর্মকান্ডের একটি সমন্বিত আলোচনা। রাসূলুল্লাহ ((ﷺ-কে যখন তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট দ্বীনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল সেই প্রসঙ্গে মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণাদি এ কারণেই তুলে ধরা হল, যাতে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর কিভাবে মিথ্যা এবং বাতিলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হক পন্থীদের কিভাবে অন্যায়-অত্যাচারে সম্মুখীন হতে হয় তার একটি চিত্র নাবী কারীম ((ﷺএবং সাহাবীগণের (রাঃ) সম্মুখে বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এ সূরাহর মধ্যে নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতিসমূহ, যথাঃ ফেরাউন ও তার দল ব্যতীত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আদ, সামুদ, ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়, লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং আসহাবুল আইকার পরিণতির কথাও উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল কওম নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদের উপর তাদের হঠকারিতার পরিণতি, কী কৌশলে আল্লাহ তাঁদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং

ঈমানদারগণ অজস্র বিপদাপদ পরিবেষ্টিত থেকেও আল্লাহর রহমতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তা তুলে ধরাই হচ্ছে এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

দুঃখ কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

এ কথা শুনে আবূ ত্বালিব বললেন, (জিজ্ঞেস করো না) আমরা কতটুকু তোমার সাহায্য করতে পারব, তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমার কথাবার্তা কতটুকু সত্য বলে আমরা জানব। এখানে সমবেত লোকজন তোমার পিতৃ-পরিবারের সদস্য এবং আমিও অনুরূপ একজন সদস্য। পার্থক্য শুধু এ টুকুই যে, তোমার সহযোগিতার জন্য তাঁদের তুলনায় আমি অগ্রগামী আছি। অতএব, তোমার নিকট যে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে থাক। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরামভাবে তোমার কাজকর্ম দেখাশোনা ও তোমাকে সহানুভূতি করতে থাকব। তবে আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই।

আবূ লাহাব বললেনঃ 'আল্লাহর শপথ, এ হচ্ছে অন্যায় এবং দুষ্টামি-নষ্টামি। এর হাত অন্যদের আগে তোমরাই ধরে নাও।'

আবূ লাহাবের মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর আবূ ত্বালিব বললেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি তাঁর হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব।

المسد:1]

''আবূ লাহাবের হাত ধ্বংস হোক।' (আল-মাসাদ ১১১ : ১)

এভাবে উচ্চকণ্ঠে আহানের উদ্দেশ্য ছিল দীনের দাওয়াতের বাণী পৌছে দেয়া। এর মাধ্যমে রাসূল ((ﷺতার নিকটস্ত লোকেদের মাঝে এটা পরিস্কার করলেন যে, তাঁর রেসালাতকে সত্যায়ন করার অর্থই হলো, রাসূল ((ﷺএবং তাদের মধ্যে একটা সৌহাদ্যপূর্ণ জীবনের সূত্রপাত করণ। আর আরবে যে আত্মীয় সম্বন্ধের যে মজবুত ভিত্তি রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সতর্কবাণীর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। এর প্রতিধ্বনি মক্কার অলি-গলিতে পৌছেই নি এমন সময় নাযিল হলো

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

''কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।'' (আল-হিজর : ৯৪)

এ আয়াত অবতীর্ণের পর রাসূলুল্লাহ ((ﷺমুশরিক সমাজে ও অলি-গলি ঘুরে ঘুরে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। তাদের নিকট আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনাতে থাকলেন, অন্যান্য রাসূলগণ যা দাওয়াত দিতেন তাই প্রচার করতে থাকলেন অর্থ্যাৎ [يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ] "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।" এবং দৃষ্টির সামনেই আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে কুরাইশ নেতাদের সম্মুখে কাবাহ প্রাঙ্গণে সালাত আদায় করতেন। তাঁর দীনের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং একের পর এক লোকজন শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকলেন। ফলশ্রুতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেননি

এ উভয় দলের বাড়িতে বাড়িতে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-বিরোধীতা ক্রমে বেড়েই চললো এবং কুরাইশগণ সর্বদিক থেকে মুমিনদের ঘৃণা করতে থাকলেন এবং তাদের সাধ্যমত ইসলামের সাথে মন্দ আচরণ করতে লাগলো।

অন্যায় অত্যাচার

নবুওয়তের চতুর্থ বছরে যখন প্রথমবার সর্ব সাধারণের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হল, তখন মুশরিকগণ তা প্রতিহত করার কৌশল হিসেবে ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কৌশল কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁরা ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করে অল্প অল্প করে অগ্রসর হতে থাকেন এবং এভাবে এক মাসের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করেননি। কিন্তু তাঁরা যখন এটা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের ঐ কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপ্তিলাভের পথে তেমন কার্যকর হচ্ছে না, তখন তাঁরা সকলে পুনরায় এক আলোচনা চক্রে মিলিত হন এবং মুসলমানদের শাস্তি প্রদান ও তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক গোত্রপতি তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের শাস্তি প্রদান করা শুরু করে দিল। অধিকন্তু ঈমান আনয়নকারী দাস-দাসীদের উপর তারা অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিল।

স্বাভাবিকভাবেই আরবের নেতা ও গোত্রপতিদের অধীনে অনেক ইতর ও নিম্নশ্রেণীর লোকজন থাকতো। এসব লোকেদের তারা তাদের ইচ্ছেমত পরিচালনা করতো। এদের মধ্যে যারা মুসলামান হতো তাদের উপর তারা চড়াও হতো। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতো। তারা তাদের শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলাসহ এমন সব পাশবিক আচরণ করতে যা পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিটিও প্রত্যক্ষ করে অস্থির কিংবা বিচলিত না হয়ে পারতেন না। আবূ জাহল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার কথা শুনত তখন সে তাকে ন্যায়-অন্যায় বলে গালি গালাজ করত, অপমান-অপদস্থ করত এবং ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাত। জ্ঞাতি গোষ্ঠীর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি মুসলিম হতো তাহলে তাকে সে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারধোর করত এবং মারধোর করার জন্য অন্যদের প্ররোচিত করত।

‘উসমান বিন আফফানের চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে নীচ থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত’।

মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর মা যখন তার ইসলাম গ্রহণের খবর পেল তখন সে তার খানা পানি (আহারাদি) বন্ধ করে দিল এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। প্রথম জীবনে তিনি আরাম আয়েশ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে সর্পের গাত্র থেকে খুলে পড়া খোলসের মতো তার শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়ত।

বিলাল, উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহীর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উমাইয়া তার গলায় দড়ি বেঁধে ছোকরাদের হাতে ধরিয়ে দিত। তারা সেই দড়ি ধরে তাঁকে পথে প্রান্তরে টেনে হিচড়ে নিয়ে বেড়াত। এমনকি টানাটানির ফলে তার গলায় দড়ির দাগ বসে যেত। উমাইয়া স্বয়ং হাত পা বেঁধে তাকে প্রহার করত এবং প্রখর রোদে বসিয়ে রাখত। তাকে খানা পানি না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখত। এ সবের চেয়েও অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর হতো তখন যখন দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের সময় কংকর ও বালি আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং তাকে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হতো। তারপর বলত আল্লাহর শপথ তুই এভাবেই শুয়ে থাকবি। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বি। অথবা মুহাম্মাদ ((ﷺ-এর সঙ্গে কুফরী করবি। বিলাল(রাঃ) ঐ অবস্থাতেই বলতেন, 'আহাদ, আহাদ''। (অর্থ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)। একদিন বিলাল (রা.) এমনভাবে এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিলেন তখন আবূ বাকর সিদিক (রা.) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বিলাল (রা.)-কে এক কালোদাসের বিনিময়ে এবং বলা হয়েছে যে, দু'শত দেহরাম (৭৩৫ গ্রাম রুপা) অথবা দু'শ আশি দিরহামের (১ কেজিরও বেশী রুপা) বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

আম্মার বিন ইয়াসির বনু মাখযুমের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির এবং মাতার নাম সুমাইয়া। তিনি এবং তাঁর পিতামাতা সকলে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর কেয়ামতের আযাব ভেঙ্গে পড়ে। দুপুর বেলা প্রখর রোদ্র তাপে মরুভূমির বালুকণারাশি এবং কংকর রাশি যখন আগুণের মতো উত্তপ্ত থাকত তখন আবূ জাহলের নেতৃত্বে মুশরিকগণ তাদেরকে নিয়ে গিয়ে সেই উত্তপ্ত বালি এবং কংকরের উপর শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। এক দিবস তাদেরকে যখন সেভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল এমন সময় রাসূলুল্লাহ ((ﷺসেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "হে ইয়াসিরের বংশধর ধৈর্য্য

ধারণ করো, তোমাদের স্থান জান্নাতে'। অতঃপর শাস্তি চলা অবস্থায় ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন।

পাষণ্ড আবূ জাহল আম্মারের মা সুমাইয়ার নারী অঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে। অতঃপর তিনি মারা যান। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ। সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত ছিলেন আবূ হুজাইফাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন মাখযুমের ক্রীতদাসী। সুমাইয়া ছিলেন অতি বৃদ্ধা এবং দুর্বল।

'আম্মারের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। কখনো তাকে প্রখর রোদে শুইয়ে দিয়ে তার বুকে লাল পাথর চাপা দেয়া হতো, কখনো বা পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেয়া হতো। মুশরিকগণ তাকে বলত, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ ((ﷺ-কে গালমন্দ দেবে এবং আমাদের উপাস্য লাত এবং উযযা সম্পর্কে উত্তম কথা না বলবে ততক্ষণ তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হবে না। নেহাৎ নিরূপায় হয়ে 'আম্মার (রা.) তাদের কথা মেনে নিলেন। তারপর নাবী করীমের দরবারে উপস্থিত হয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সবিস্তারে ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারমা অবতীর্ণ হল :

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

'কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে। (আন-নাহল ১৬ : ১০৬)

আবূ ফুকাইহাহ (রা.) বনু আব্বাস গোত্রের দাস ছিলেন। সে ছিল আযদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অপর নাম ছিল আফলাহ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তাঁর মালিক পায়ে লোহার শিকল বেঁধে, শরীর হতে কাপড় খুলে নিয়ে তাকে কংকরময় পথ ও প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়াতেন। অতঃপর তার পিঠের উপর ভারী পাথর চাপা দিত ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারতেন না। এভাবে শাস্তি দেয়ার এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এমন শাস্তি চলছিল নিয়মিতভাবে। অতঃপর তিনি হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলার সাথে তিনি হিজরত করেন। একদা তারা তার পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে উত্তপ্ত ময়দানে নিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগালো। এতে কাফিররা ধারণা করলো যে, আবূ ফুকাইহাহ মারা গেছে। ইত্যবসরে আবূ বকর (রা.) সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ক্রয় করে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ করে দিলেন।

খাব্বাব বিন আরাত খুযা'আহ গোত্রের উম্মু আনমার সিবা' নাম্নী এক মহিলার দাস ছিলেন। খাব্বাব বিন আরাত ছিলেন কর্মকার। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মু আনমার তাকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিত। উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তার পিঠ ও মাথায় সেঁক দিত যাতে মুহাম্মাদ ((ﷺ-এর দীনকে অস্বীকার করে। কিন্তু এতে তার ঈমান ও ইসলামে টিকে থাকার সংকল্প আরো বৃদ্ধি পায়। আর মুশরিকগণ তার উপর নানাধরণের নির্যাতন চালাতেন। কখনো বা খুব শক্ত হাতে চুল টানাটানি করে নিষ্পেষণ চালাতেন। কখনো বা আবার খুব শক্ত হাতে তার গ্রীবা ধরে মুচড়ে দিতেন। এক সময় তাকে কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হয়েছিল যাতে তিনি উঠতে না পারেন। এতে তার পৃষ্ঠদেশ পুড়ে গিয়ে ধবল কুষ্ঠের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল।

রুমী কৃতদাসী যিন্নীরাহ[৪] ইসলাম গ্রহণ করলে এবং আল্লাহর উপর আনার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। তাকে চোখে আঘাত করা হয় ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ হওয়ার পরে তাকে বলা হলো তোমাকে লেগেছে। উত্তরে যিন্নীরাহ বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে লাত ও উযযার আসর লাগে নি। বরং এটা আল্লাহর একটা অনুগ্রহ এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তা ভাল হয়ে যাবে। অতঃপর একদিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তার চক্ষু ভাল করে দিয়েছেন। তার এ অবস্থা দর্শন করে কুরাইশরা বলল, এটা মুহাম্মাদ ((ﷺ-এর একটা যাদু।

বনু যুহরার কৃতদাসী উম্মু 'উবায়েস ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুশরিকগণ তাকে শাস্তি দিত; বিশেষ করে তার মনীব আসওয়াদ বিন 'আবদে ইয়াগুস খুব শাস্তি দিত। সে রাসূলুল্লাহ ((ﷺ-এর ঘোরতর শত্রু এবং ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের অন্যতম ছিল।

বনু আদী গোত্রের এক পরিবার বনু মুয়াম্মিলের এক দাসীর মুসলিম হওয়ার সংবাদে 'উমার বিন খাত্তাব তাকে এতই প্রহার করেছিলেন যে, তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে এ বলে ক্ষান্ত হয়েছিলেন, 'মানবত্বের কোন কারণে নয় বরং খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে শাস্তি দেয়া থেকে আপাততঃ তোমাকে রেহাই দিলাম। অতঃপর বলতেন, তোমার সাথে তোমার মনিব এমন আচরণই করবে।[৫] ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল উমার (রা.) ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে।

নাহদিয়া এবং তার কন্যা উম্মু উবায়েস সকলেই দাসী ছিলেন। এঁরা উভয়েই বনু আব্দুদ্দার গোত্রের। ইসলাম গ্রহণের পর এরা সকলেই মুশরিকদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার ফলে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার সম্মুখীন হন।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যে সব দাসকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মখীন হতে হয় তাদের মধ্যে আমির বিন ফুরায়রাও একজন। তাকে এতই শাস্তি দেয়া হয় যে, তার অনুভূতি শক্তি লোপ পায় এবং তিনি কি বলতেন নিজেই তা বুঝতে পারতেন না।

অবশেষে আবূ বাকর (রা.) দাস-দাসীগুলোকেও ক্রয় করে নেয়ার পর মুক্ত করে দেন। এতে তাঁর পিতা আবূ কুহাফাহ তাঁকে ভৎর্সনা করে বললেন, আমি দেখছি যে, তুমি দুর্বল দাস-দাসীদের মুক্ত করে দিচ্ছ। এর পর যদি তুমি কোন প্রহৃত ব্যক্তিকে মুক্ত কর তবে আমি তোমাকে বাধা প্রদান করবো। পিতার এ কথা শ্রবণ করত আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি তো কেবল তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই মুক্ত করি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর প্রশংসা এবং তাঁর শত্রুদের নিন্দা জ্ঞাপন করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

"কাজেই আমি তোমাদেরকে দাউ দাউ ক'রে জ্বলা আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। - চরম হতভাগা ছাড়া কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। - যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়"। (সূরাহ আল-লাইল ৯২ : ১৪-১৬)

উপর্যুক্ত আয়াতে ধমকী উমাইয়া বিন খালাফ ও তার মতো আচরণকারীদের উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

"তাথেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে, - যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, - (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, - একমাত্র তার মহান প্রতিপালকের চেহারা (সন্তোষ) লাভের আশায়। - সে অবশ্যই অতি শীঘ্র (আল্লাহর নিমাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরাহ আল-লাইল ৯২ : ১৭-২১)

উপর্যুক্ত আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন, আবূ বাকর সিদীক (রা.)।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আবূ বকর (রা.)-কেও শাস্তি পেতে হয়েছে। তাঁকে এবং তাঁর সাথে ত্বালহাহ বিন উবাইদুল্লাহকে সালাত থেকে বিরত রাখতে এবং দীন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নওফেল বিন খুওয়াইলিদ একই রশিতে শক্ত করে বোঁধে রাখতো। কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। তাঁরা উভয়ে সর্বদা এক সাথে সালাত আদায় করতেন। এজন্য তাঁদেরকে 'কারীনাইন' (দু' সঙ্গী) বলা হয়।

আবার এও বলা হয় যে, তাদের সাথে এরকম করার কারণ, ‘উসমান বিন উবাইদুল্লাহ- ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহর ভাই।

প্রকৃত অবস্থা ছিল মুশরিকগণ যখন কারো মুসলিম হওয়ার সংবাদ পেতেন তখন তাদের কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তারা উদ্বাহু এবং বদ্ধ পরিকর হয়ে যেতেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দরিদ্র মুসলমানদেরকে শাস্তি দেয়া ছিল তাদের নিকট একটি মামুলি ব্যাপার। বিশেষ করে দাস-দাসীদের শাস্তি দিতে কোন পরওয়াই করতো না। কেননা তাদের শাস্তি দেয়া কারণে কেউ ক্রুদ্ধও হতো না আর তাদের শাস্তি লাঘবের জন্য কেউ এগিয়েও আসতো না। বরং তাদের মনিবেরাই স্বয়ং শাস্তি প্রদান করতো। তবে কোন বড় ও সম্ভান্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের শাস্তি দেয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে তারা যখন তাদের গোত্রের সম্মানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হতেন। এসব সম্ভ্রান্ত লোকের উপর মুশরিকরা সামান্যই চড়াও হতো যদিও এদেরকেই তারা দীনের ক্ষেত্রে বেশি ভয় করতো।

দাওয়াত ও তাবলীগে সাহাবিদের অবদান

সাহাবী শব্দের অর্থ সঙ্গী, সাথি বা বন্ধু। প্রবাদ আছে দুঃসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। ইসলামের দুঃসময়ে সহাবায়ে কেরামকে রাসূল সাথি বা বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন। শরীয়তের পরিভাষায় সাহাবী সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি রাসূল (সা.) এর উপর ঈমান এনেছেন এবং ঈমানের উপরই মৃত্যু বরণ করেছেন। এভাবেও বলতে পারি যে, সাহাবায়ে কেরাম হলেন ঐ সকল ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.) এর সঙ্গীরূপে নির্বাচিত করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামদের সম্মান ও ভালবাসা ঈমানের অংশ বিশেষ। কুরআনে কারিমের সূরাতুল ফাতাহ এর ২৯ নং আয়াতে সাহাবায়ে কেরামদের পরিচয় ও মর্যাদা নিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের উপর অত্যান্ত কঠোর । পরস্পরের প্রতি দয়াশীল আপনি তাদের কে রুকু করা সিজদা করা অবস্থায় দেখতে পাবেন। তারা আল্লাহর করুনা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের পরিচয় হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার আলামত আছে।

ইরশাদ হচ্ছে, যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কন্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার (সূরা হুজরাত- ৩)

সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণির্ত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সাহাবাদের মন্দ বলো না, কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করফ, তবুও তাদের দানের সমতুল্য হবে না।

প্রখ্যাত সহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে আমার সাহাবী কে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল তাকে আল্লাহ পাকড়াও করবেন। (মুসনাদে আহমেদ) রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যে মুসলিম হিসেবে আমাকে দেখেছে এবং আমি যাদের দেখেছি, তাদেরকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না। (তিরমিজী শরীফ- ৩৮০১)

একটি হাদিসে তিনি আরো বলেন, আমার কোনো সাহাবী কোনো স্থানে ইন্তেকাল

করলে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন ঐ এলাকার নেতা হিসাবে উঠাবেন। ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন ইসলামের নক্ষত্র । আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে নবীজির সোহবতে থাকার জন্য বাছাই করেছেন। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, যারা সাহাবাগণের সমালোচনা করবে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানবকুলের লানত নেমে আসবে তাদের ফরজ ও নফল কোন আমলই আল্লাহ তাআলা কবুল করবে না। (কুরতুবি ৮/১৯৬)

ইসলামে সাহাবায়ে কেরামদের অবদান অপরিসীম। তম্মধ্যে কুরআন শরীফ একত্রীকরণ ও সংরক্ষণে অবদান অতুলনীয়। রাসূল (সা.) সাহাবীদের কুরআন হিফজ করতে উৎসাহ দিতেন। তাই রাসূলের জিবদ্দশায় বহু সংখ্যক সাহাবী কুরআন শরীফ মুখস্ত হিফজের মধ্যমে সংরক্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, রাসূল (সা.) কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধ আকারেও সংরক্ষণের জন্য, উত্তম সাহাবীদের মধ্য থেকে ৪০ জনের একটি লেখক দল মনোনীত করেন, যাদেরকে কাতেবে ওহী বলা হয়। যাদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনসহ আবু বকর, উমর, আলী, ওসমান , মুয়াজ বিন জাবাল , যায়েদ বিন সাবেত আমিরে মুআবিয়া (রা.) উল্লেখযোগ্য।

হাদীস সংরক্ষণে সাহাবাদের অবদান অনেক । রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ হাদীসসমূহ মুখস্থ করে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেন। আবার অনেক সাহাবী রাসূলের অনুমতিতে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর শিয়া খাওয়ারেজ, মুনাফিকরা হাদীস বিকৃত করে রাসূল (সা.) এর নামে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করলে অসংখ্য সাহাবী অতন্দ্র প্রহরীর মত হাদীসসমূহ রক্ষা করেন। হাদীস বর্ণনাকারী বা মুহাদ্দীস সাহাবীগণের মধ্যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনাকৃত ৫৩৭৪ হাদীস, আয়েশা (রা.) ২২১০ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ২৬৬০, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ২৬৩০, আনাস বিন মালেক ২৬৮৬, আবু সাঈদ খুদরী ২২৭০ হাদীস রেওয়ায়েত করেন। এছাড়াও প্রায় লক্ষাধিক সাহাবী হাদীস সংরক্ষণে ঐতিহাসিক অবদান রাখেন।

ইসলামের খাতিরে সাহাবায়ে কেরামদের হিজরত একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। রাসূল (সা.) এর নির্দেশে হযরত ওসমান (রা.) তার স্ত্রী রোকাইয়াসহ মোট ১৫ জনের সাহাবীর একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এটিকে ইসলামের প্রথম হিজরত বলে। কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ৬২২ সালে, রাসূল (সা.) এর অনুমতিক্রমে সাহাবায়ে কেরাম নিজের বাড়ী ঘর সহায়-সম্পত্তি মাতৃভ'মি ও আপন

জনের মায়া ত্যাগ করে মদিনা শরীফ হিজরত করেন । মদিনায় আনসার সাহাবীগণও মুহাজিরদের আনন্দচিত্তে বরণ করেন এবং সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেন। দীন প্রচারের জন্য কায়স ইবনে হুযাইফা , উরওয়া ইবনে আছাছাসহ কিছু হাবশি মুসলমান নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনের পথে রওয়ানা হন পথিমধ্যে তাদের জাহাজ চট্টগ্রামেও নোংগর করার কথা ইতিহাস থেকে পাই। কারণ এটি জাহাজ চলাচলের একটি নিরাপদ ট্রানজিট। এভাবে রাসূলের হাতেগড়া সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের প্রচার প্রসারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হিজরত করেন।

আল্লাহর রাস্তায় দানের ক্ষেত্রেও এই দলের অবদান নজিরবীহিন। ইসলামের দূদির্নে, মুসলমানের অভাব অনটনে, যে কোন দূভির্ক্ষে ও যুদ্ধ বিগ্রহে পরস্পরের মধ্যে দান খয়রাত নিয়ে প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে সূরা বাইয়িনায় ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাদের উপর রাজি তারাও আল্লাহর উপর রাজি ।

যুদ্ধের ময়দানে সাহাবায়ে কেরামদের অবদান অপরিসীম। রাসূল ((সা.)) জীবনে সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে প্রায় ২৭ টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) যখনি যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের খাতিরে আপন জীবন ও পরিবারকে বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছেন। বদর যুদ্ধে ১৪ জন, উহুদ যুদ্ধে ৭০, খায়বার যুদ্ধে ১৬, মুতার যুদ্ধে ১২ সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এছাড়াও বানু নযীরের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে, হুনায়ন যুদ্ধে, তাবুক যুদ্ধে হুদায়বিয়ার সন্ধিসহ ও মক্কা বিজয়েও সাহাবারা ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ইসলাম গ্রহণের জন্য সাহাবায়ে কেরামদের নিযার্তনের ইতিহাস শুনলে গা শিউরে উঠে। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বিলাল হাবশী (রা.) যিনি মসজিদে নববীর স্থায়ী ও ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুয়াজ্জিন ছিলেন। ইসলামের চিরশত্রæ আবু জেহেল ও উমাইয়া ইবনে খালাফ দিনের বেলায় তাকে উত্তপ্ত বালিতে শোয়ায়ে ভারি পাথর তার বুকের উপর চাপিয়ে দিতো তবুও বিলাল (রা.) এ করুন পরিস্থিতিতেও বলতেন, আহাদ আহাদ তথা আমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ ।

একদা খলীফা হযরত উমর রা খুবাইব (রা.) কে নির্যাতন ভোগের কথা জিজ্ঞাস করলেন। হযরত খুবাইব বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে জ্বলন্ত লোহা গরম করে আমাকে আঘাত করত, লোহার পোশাক পরিয়ে প্রচন্ড গরমে ফেলে রাখত, লোহার গরম আর প্রচন্ড তাপে আমার শরীরের গোশত খষে পড়ত। প্রজ্জলিত কয়লার উপর আমাকে টানা-হেচড়া করত। আমার গায়ের রক্ত ও চর্বি ঝরে আগুন নিভে যেত,

তবুও আমি ইসলাম ছাড়িনি। এভাবে হযরত খুবাইবকে কাফের সম্প্রদায় বলেছিল যে, মুহাম্মদ ((সা.)) কে অসিকার করতে, তিনি রাজি না হওয়ায়, তীর বর্ষা ও খনজরের আঘাতে তাকে জর্জরিত করা করা হলে তিনি কালেমা পড়তে পড়তে শাহাদাত বরণ করলেন। ইসলাম ও রাসূলের প্রতি খুবাইব (রা.) এর এই ভালবাসা দেখে সায়িদ বিন আমেরসহ আরো অনেকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন । সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামদের সম্মান ও ভালবাসা নিয়ে তাদের নমুনায় আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দাওয়াত ও তাবলীগ অর্থাৎ ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে সাহাবিদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও ইতিহাসগর্বিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই দায়িত্বকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবিগণ কেবল ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তারা দাওয়াতকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে একে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন।

রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবিরা বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরিত হন। যেমন: মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)-কে মদিনায় প্রেরণ করা হয়, যিনি মদিনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনি ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। তাছাড়া, সাহাবিদের একটি বিশেষ দল ছিল যারা বিভিন্ন কাবিলা ও অঞ্চলে গিয়ে কুরআন শিক্ষা দিত, নবীজীর বার্তা পৌঁছে দিত এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করত।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবিরা ইসলাম প্রচারে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারের জন্য বিস্ময়কর আত্মত্যাগ ও পরিশ্রম করেছেন। আবু বকর (রা.) খিলাফতের সময় মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। ওমর (রা.)-এর শাসনামলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায় সিরিয়া, ইরাক, মিশর ও পারস্য পর্যন্ত। উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর আমলেও সাহাবিদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, সাহাবিরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে কেবল বক্তৃতা বা প্রচারেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং তারা নিজেদের চরিত্র, আচরণ, ইখলাস ও তাকওয়ার মাধ্যমে ইসলামকে মানুষের মাঝে জীবন্ত করে তুলতেন। তাদের জীবনের প্রতিটি কাজেই দাওয়াতের প্রতিফলন ঘটত। তাদের নৈতিকতা, ইনসাফ, দয়া, আত্মত্যাগ ও দায়িত্ববোধ অমুসলিমদের হৃদয় জয়ে বড় ভূমিকা রাখত।

সাহাবিদের এই দাওয়াতি কার্যক্রমের কারণে ইসলাম আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের প্রচেষ্টাই পরবর্তীকালে ইসলামের একটি বিশ্বজনীন ধর্মে রূপান্তর নিশ্চিত করে। দাওয়াত ও তাবলীগে সাহাবিদের এই অসাধারণ অবদান আজও আমাদের জন্য প্রেরণা এবং আদর্শস্বরূপ।

দাওয়াত ও তাবলীগে তাবেইনদের অবদান

তাবেয়ীনগণ ছিলেন সাহাবিদের প্রত্যক্ষ ছাত্র ও ইসলামের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইলম অর্জন করে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানান। তাবেয়ীনদের অনেকেই মসজিদভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করেন, হালকা ও মজলিসে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেন এবং কুরআন-হাদীসের জ্ঞান প্রচার করেন। তাঁরা মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, শাম, খোরাসান, মিশর, এমনকি হিন্দুস্তান পর্যন্ত সফর করে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেন। তাদের মধ্যে হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আতাআ ইবনে আবি রাবাহ (রাহি.) প্রমুখ দাওয়াত ও তাকওয়ার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন। তাঁরা ইলম, তাকওয়া, আখলাক ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী চেতনার বুনিয়াদ গড়ে তোলেন। জুলুম-অত্যাচার, দরিদ্রতা ও প্রবাসজীবনের কষ্ট তাদের দ্বীনি কাজে বাধা দিতে পারেনি। তাদের দাওয়াতি প্রচেষ্টা ছিল নিঃস্বার্থ, গভীর ও আখিরাতনির্ভর, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক মহান আদর্শ ও পথনির্দেশনা হয়ে আছে।

হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর দ্বারা জীবনেই আত্মত্যাগের এক অত্যুজ্জ্বল নমুনা তিনি সংসার বিরাগী ছিলেন না। তবে তিনি ধর্মের উন্নতি প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যাপৃত থাকায় কোনো সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি। জীবনের সমস্ত সময়টুকু তিনি নিজের আত্মার উন্নতি ও ইসলামের উন্নতির কাজে ব্যয় করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তিন বছর আফগানিস্তানের হিরাত প্রদেশে অবস্থান করেন। এছাড়া জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি কেবল ধর্মপ্রচার এবং জনগণকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বহু স্থানে গমন করে অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করেন। এমনকি রাজনৈতিক কারণে কোনো সময় বক্তৃতা দেওয়া নিষেধ করা হলেও হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর বক্তৃতা দেওয়া নিষেধ করা হয়নি। তাঁর বক্তৃতার অংশ বিশেষ বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর কথা-বার্তার ধরন বা স্টাইল প্রবাদ বাক্যের মতো ছিল। তাঁর বক্তৃতা যুক্তিগুলো যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি অকাট্য। তাঁর বক্তৃতার ও কথা-বার্তার ধরনের নবীদের কথা-বার্তার ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের দাওয়াত ও তাবলীগ

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ধরা হয় ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের সময় থেকে। ইসলাম এসময়ে রাজনৈতিকভাবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় একথা সত্য হলেও, ইসলামের সাথে ভারতবাসীর পরিচয় হয় রাসূল সা.-এর সময় থেকেই। ভারতের আধুনিক তামিলনাড়– রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চল মালবারে প্রাচীনকালে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন চেরুমল পেরুমল। তিনি রাসূল সা.-এর কথা শুনতে পান আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। এমনি একটি আরব বণিকদলের সাথে তিনি মদিনা সফরে আসেন এবং রাসূল সা.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর ফলে মালাবার ভারতে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজা পেরুমলের প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম মসজিদ এখনো কেরালা রাজ্যে বিদ্যমান। এইচ জে রলিসন তার “ÒAncient and Mediaval History of India” গ্রন্থে বলেছেন, সপ্তম শতকের শুরুতে মালাবার এলাকায় আরব মুসলিম বণিকরা তাদের বসতি স্থাপন করেন। প্রথম ভারতীয় মসজিদ নির্মিত হয় ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে। রাম বর্মা কুলা শেখারা এই মসজিদ নির্মাণ করেন। কেরালার কদুঙ্গেলা এলাকায় এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মালিক বিন দিনার তার ইতিহাস গ্রন্থে এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন।

মালাবারের মাপিলিস সম্প্রদায় সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত হবার কারণে মালাবারের সাথে আরবদের নিবিড় সংযোগ ছিল। এ কারণে তারাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। ধারণা করা হয় যে, মালাবারবাসীর মধ্যে আরবদের রক্ত রয়েছে। মূলত বিয়ে এবং ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। রাসূল সা.-এর একটি বিখ্যাত হাদিস হচ্ছে শেষ জমানায় ভারতের সৈন্যরা দুনিয়ায় আবার ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াবে। এ কারণে মুসলমানদের মধ্যে ভারত জয়ের একটি প্রবণতা সবসময় ছিল। সাহাবা রা.-গণও বিভিন্ন সময়ে ভারতের পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শরিক হতেন।

খলিফা ওমর রা.-এর সময়ে হিজরি ২৩ সালে মোতাবেক ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত জয়ের এক অভিযান প্রেরণ করা হয়। হাকাম বিন আমর আল তাগরিব এরূপ একটি অভিযান নিয়ে সিন্ধু নদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এসময় পশ্চিম ভারতেও জলপথে ভারত

জয়ের অভিযান চালানো হয়। তবে মুসলমানরা এসময় কোনো ভূমি জয় করতে পারেননি। খলিফার আদেশে অভিযান বন্ধ করার কারণেই এমনটি হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেছেন। আরব জেনারেল আল হাকাম ভারতে তার অভিযান পরিচালনা করার জন্য সাহাবি সুহার বিন আল আবদিকে খলিফা উমর রা.-এর দরবারে পাঠান। সুরার খলিফার কাছে ভারতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, এটি এমন একটি দেশ যা নানা রকমের খারাবিতে পূর্ণ। তিনি বলেন, এখানকার মানুষেরা সাহসী। বিশাল সেনবাহিনীকে এখানে মনে হয় ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী হারিয়ে যাবে এর বিশালতায়। এ ধরনের বর্ণনা শুনে খলিফা ওমর রা. ভারতে অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকতে বলেন।

উসমান বিন আবিন আল আস আল সাকাফি বোম্বের সমুদ্রবন্দর থানার মাধ্যমে প্রথম নৌ অভিযান পরিচালনা করেন ভারতে। তিনি বাহরাইনের গভর্নর ছিলেন। তবে এই অভিযানে আরবরা কোন ধরনের ভূমি জয় করতে ব্যর্থ হয়। যদিও ঐতিহাসিকরা থানার এই অভিযানকে মুসলমানদের একটি সফলতা হিসেবেই দেখে থাকেন। কেননা এই অভিযান তার পূর্ণতা পাবার আগেই খলিফার নির্দেশে বন্ধ করা হয়। ভারতে মুসলিমদের অভিযানে যেসব সাহাবা অংশগ্রহণ করেন তাদের কিছু কিছুও নাম পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে আছেন, আবদুল্লাহ বিন উতবান, আসিম বিন আমর আল তামিমি, সুহার বিন আল আবদি, সুবাইল বিন আদি এবং হাকাম বিন আবি আর সাকাফি। খলিফা উসমানের শাসনামলে উবাইদুল্লাহ বিন মামার আর তামিমি সিন্ধুর মুকরান এলাকায় বিদ্রোহ দমন করেন। শুধু তাই নয় তিনি সিন্ধু নদের অববাহিকা পর্যন্ত আরব প্রভাব বিস্তার করেন। ২৯৬/৩০ সালে উবাইদুল্লাহ ফারসের গভর্নর হয়ে চলে যান। তার স্থলে উমাইর বিন উসমান এখানকার গভর্নর নিযুক্ত হন।

আমির মুয়াবিয়ার সময়ে আল মুহাল্লাব আব্দুর রাহমান বিন সামুরার অধীনে একজন আরব জেনারেল ভারতে অভিযান চালান। মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি ভারতের কেন্দ্রস্থলে অগ্রসর হন। তার সেনাদলে মূলত নিজের গোত্রের লোকেরাই ছিল। তিনি কাবুলের দিকে অগ্রসর হয়ে লাহোর পর্যন্ত অভিযান চালান। ৪৪ হিজরি (৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি এই অভিযান চালান। অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। তবে ফিরিস্তা এক বর্ণনায় বলেন যে, আল মুহাল্লাব ভারত থেকে ১২ হাজার বন্দি নিয়ে যান যাদের অনেকে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল খাতিব

আল বাগদাদী বলেন যে, খালাফ বিন সালিম আল সিন্ধি (মৃত্যু ২৩১) মুহাল্লাব পরিবারের একজন সদস্যও হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন। এ থেকে ধারণা করা যায় যে তিনি হয়তো মুহাল্লাবের গ্রেফতার করে আনা কোনো একজন যুদ্ধবন্দির বংশধর ছিলেন।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বন্দর ছিল ইসলাম আগমনের আরেকটি কেন্দ্র। মূলত সেসময়ে চীন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্র। চীন যাবার পথে চট্টগ্রাম বন্দরকে যাত্রাবিরতি কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ৬১৮ খ্রিস্টাব্দে সাহাবি আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে একটি দল চট্টগ্রাম আসেন বলে মুহাদ্দিস ইমাম আবাদনা মারওয়াজি বর্ণনা করেছেন। তবে ভারতে ইসলাম বিজয়ের বেশে এলেও এখানে এর বিকাশ ঘটেছে মূলত সুফি সাধকদের মাধ্যমে। এ কারণেই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুফি সাধকদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়।

কাদেরীর মতে (১৯৬৮-৯৭) ভারতে মুসলমানদের শাসন শুরু হয় মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত জয়ের পর থেকে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু জয় করেন। ইসহাক (১৯৫৫) উল্লেখ করেছেন যে, যদিও সিন্ধু জয়ের অভিযান শুরু হয় সাহাবাদের সময় থেকেই ২৩ হিজরি/ ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে, তবে তা শেষ পর্যন্ত জয় করা হয় তাবিউনদের প্রাথমিক যুগে। প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই ভারতের সাথে আরবদের বাণিজ্যিক, সামাজিক এবং মিত্রতামূলক যোগাযোগ ছিল। অনেক আরব ভারতে এসেছিলেন ব্যবসায়ী হিসেবে এবং ভারতকে আরবদের বন্ধুতে পরিণত করেছিলেন। পরবর্তীকালে আরবদের সাথে সামাজিক মেলামেশার কারণে ভারতীয়রা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তারা কেবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি আরবি ভাষাও খুব ভালো ভাবে শেখে। অনেক ভারতীয় মুসলিম আরব বিশ্বে দীর্ঘদিন অবস্থান করে এবং দেশে ফিরে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শারফুদ্দিন (১৯৮৪) উল্লেখ করেছেন যে, আদিকাল থেকেই ভারতীয়দের সাথে আরবদের ব্যবসায়িক, সামাজিক এবং সমঝোতামূলক সম্পর্ক ছিল। সুফিরা ভারতীয়দের ইসলামী ছায়াতলে আনতে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তার মানে হলো ইসলাম এবং কুরআন ভারতে এসেছে শতাব্দীকাল আগে। এটি এমন এক সময় ছিল যখন অনেকেই আরবি জানতেন খুব ভালোভাবে। আরবিতে অনেক তাফসির লেখা হয়। তবে পর্যায়ক্রমে আরবি ভাষা তার প্রভাব হারায় এবং তার জায়গায় উর্দু স্থান করে নেয়। তবে এসব অনুবাদ ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে কোনো

গুরুত্ব এখন বহন করে না। তবে এগুলো তাফসিরের ভাষা হিসেবে উর্দুর বিবর্তনকে বুঝতে সহায়তা করে।

সাহাবা ও আরব বণিকদের আগমন

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের আগ থেকেই ভারতে অনেক আরব বণিকের আগমন ঘটে। তাঁদের সাথে ভারতীয়দের আলাপ-আলোচনা ও সামাজিক এবং বাণিজ্যিক বন্ধনের কারণে আরবি ভাষা অনেক ভারতীয় আরবি ভাষা চর্চা করেন। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কিছু সাহাবা বণিক ভেসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার। ভারতবর্ষে প্রথম হিজরি শতাব্দীতেই ইসলামের আগমন ঘটে। আল্লাহর রাসূলের কতিপয় সাহাবার পদধূলিতে ধন্য হয় এই অঞ্চল। রাসূলে কারিম সা. বিদায় হজে উপস্থিত সাহাবাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন যে, "আজকে তোমরা যারা উপস্থিত আছো তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যারা অনুপস্থিত রয়েছে তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেওয়া।" আল্লাহর রাসূলের উক্ত নির্দেশনা শোনার পর দাওয়াত ইলাল্লাহর অনুভূতি নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের একটি অংশ বিভিন্ন দেশে ছুটে যান। ভারতীয় উপমহাদেশে কিছু সাহাবার আগমন করেন। হযরত ওমর ফারুক রা.-এর সময়ে হযরত হাকাম ইবন আবুল আস, হযরত মামুন ও হযরত মোহাইমেন প্রমুখ সাহাবা বাংলাদেশ আগমন করেন বলে জানা যায়। মূলত ইসলামের দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সাহাবাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা মানবতাকে মানুষের গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে আহবান করার জন্য বিভিন্ন দেশে ছুটে গিয়েছেন এবং সেই আহবানে সাড়া দিয়ে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, অগ্নিপূজক, নাস্তিক অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

সুফি সাধক পীর-দরবেশদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার

ভারতে ইসলাম প্রচারে সুফি-সাধক, পীর-আউলিয়া এবং উলামায়ে কেরামের বিরাট অবদান রয়েছে। তুরস্ক, খোরাসান ও ইরান থেকে অনেক সুফি-দরবেশ ইসলামকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন।৩ মুসলিম সুফি সাধকদের মাঝে নিযামুদ্দিন আউলিয়া, হযরত মঈনুদ্দিন চিশতী, হযরত শাহজালাল, শাহ মাখদুম, বায়েজিদ বোস্তামী, মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কারণে সুফিবাদ ও পীরবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষ সুফি, সাধু-সন্ন্যাসী দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত। তাদের অনেকেরই মৃত্যুর পর তাঁদের কবরকে মাজারে পরিণত করে কবর পূজা, মাজার পূজার নামে ব্যবসা চলছে। মাইজভান্ডারী এবং তথাকথিত সুন্নির নামে শিরক-বিদয়াতের অনুসরণ হচ্ছে অনেক অঞ্চলে। সত্যিকারার্থে ইসলামের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিরক-বিদয়াতের চর্চা এক বিরাট বাধা। একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজে ইসলামী ভাবধারার লালন এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। শিরক-বিদয়াতমুক্ত সহিহ ইসলামী তাহজিব-তমদ্দুন মানুষের সামনে তুলে ধরতে।

ভারতে মুসলিম শাসনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

ভারতে মুহাম্মদ বিন কাসিম এর নেতৃত্বে সিন্ধু বিজয়ের আগেই বিভিন্ন পীর-দরবেশ ও আরব বণিকদের আগমন ঘটে। মুহাম্মদ ইবন কাসিম উমাইয়াদের অধীনে নিযুক্ত থাকলেও তাঁর রক্তধারায় ছিল ইসলামের আদর্শ। কিন্তু তাঁর শাসন স্থায়ী না হওয়ায় ইসলাম বিস্তৃতির সুযোগ পায়নি। কিন্তু সূচনালগ্ন থেকে ভারতের আর্য সভ্যতা ও দর্শনের সাথে ইসলামী সভ্যতা ও দর্শনের সংঘাত শুরু হয়। একটা পর্যায়ে ভারতীয় জনসাধারণ বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বৌদ্ধ সমাজে নানাবিধ অনাচারের কারণে জনতা ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে হিন্দু সংস্কৃতি শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি করে। যখন ভারতে মানুষের দ্বারা মানুষ চরমভাবে অপমানিত হতে লাগল তখন তুর্কিদের দ্বারা উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারিত হলে সাধারণ মানুষ ইসলামের মধ্যে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়। পুরোহিতরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। কিন্তু ইসলামের তাওহিদের মূলমন্ত্রে মানুষ ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে যেসব বিজয়ী পাঠান বা তুর্কিরা এদেশে শাসন করেছিলেন তারা ছিলেন নবদীক্ষিত মুসলিম। তাঁরা ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেয়ে তাদের বংশ প্রতিষ্ঠা করার কাজেই বেশি ব্যস্ত ছিলো। এই ক্ষেত্রে কয়েকজন সম্রাট ব্যতিক্রম ছিলেন।সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামল থেকেই মোগল সম্রাটদের নীতিতে পরিবর্তন শুরু হয়। সম্রাট শাহজাহান (১০২৭-১০৬৮) এই পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়।সম্রাট আকবরের সময়ে রাজদরবারে যেসব অনৈতিকতার বীজ বপন করা হয় এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এরই প্রভাব যেভাবে বদ্ধমূল হয় তা দূর করা সময় সাপেক্ষে ছিল। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সংস্কার শুরু হলেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় তা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ইসলামী অনুশাসন প্রবর্তন করেন। যদিও তিনি রাজতান্ত্রিকতার ধারাবাহিকতায় মসনদে আসীন হন তারপরও তাঁর সময়কাল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সোনালি অধ্যায় ছিল।

বাংলাদেশে ইসলাম ও ইসলামের দাওয়াত

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

ইসলামের আবির্ভাবের সময় এ অঞ্চলটি বঙ্গ বা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। সে সময় বাংলা বা বঙ্গ অঞ্চলের সীমানা শুধু বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিল না। বরং তৎকালীন বঙ্গদেশের সীমানা ছিল বেশ বিস্তৃত।

ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন যুগে বাংলা ছিল প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত এক বিশাল সমভূমি। বস্তুত এ বিশাল বাংলা অঞ্চলে কবে ইসলামের আগমন ঘটে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের সিন্ধু বিজয় গোটা ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও বহু মুসলিম মুবাল্লিগ ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন। এ সময় মাহমুদ ও মুহায়মিনের নেতৃত্বে একদল ধর্মপ্রচারক এ দেশে আগমন করেন বলে জানা যায়। পরে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এ দেশে ধর্ম প্রচারকদের ব্যাপকহারে আগমন ঘটে।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী তৎকালীন বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন। খিলজী বিজিত রাজ্যের সীমানা ছিল-উত্তরে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত পূর্ণিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা বা পদ্মা এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

খিলজীর এ বিজয়ের ফলে বাংলায় ইসলাম ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রসারিত হয়। এ সময় থেকে দলে দলে মুসলিমরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম প্রচার কাজ শুরু করেন।

ঐতিহাসিকদের অপর এক দলের মতে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে দশম শতকের মধ্যেই এবং ধীরে ধীরে তা প্রসারিত হয়। বাংলাদেশে

ইসলামের প্রাথমিক পরিচিতি ও প্রচারকার্য পরিচালিত হয় আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে।

মুসলিম বিজয় পূর্ব বাংলায় আগত বণিকরাই এ দেশে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। এ দেশে ইসলাম আগমনের প্রধান মাধ্যম ছিল আরব-ভারত-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক। জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই আরব বণিকদের সঙ্গে এ অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রচলিত ছিল।

রাসূল (সা.) ভারতীয় সুগন্ধি দ্রব্য উপহার হিসাবে লাভ করেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূগোলবিদরা আরব-ভারত-চীন বাণিজ্য পথের নানা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাদের দেওয়া তথ্যমতে, আরব-চীন বাণিজ্য যাত্রার মূল সূত্র ছিল ভারতবর্ষ। আরব বণিকরা পারস্য উপসাগর হয়ে বেলুচিস্তানের একটি বন্দরে প্রবেশ করতেন।

তারপর একে একে সিন্ধু, গুজরাট, মাদ্রাজ ও কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হতেন। তারা এ সময় ওই অঞ্চলের সিলাহাত বা বর্তমান সিলেট ও সাদজাম বা বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরে যাত্রাবিরতি করতেন। এরপর তারা চীন সাগরে প্রবেশ করতেন।

এভাবেই আরব থেকে চীন পর্যন্ত বাণিজ্যযাত্রায় ভারত উপমহাদেশ ও বঙ্গদেশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। আরবরা মধ্যবর্তী এসব বন্দরেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন ও সফরের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতেন।

আরব ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনায়ও বাংলার নানা স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভূগোলবিদ ইবনে খুরদাদবিহ তার বর্ণনায় বাংলাদেশের চাঁদপুর নদী বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন। আল ইদ্রিসীর বর্ণনায় রয়েছে-বাগদাদ ও বাসরা থেকে আরব বণিক এবং পর্যটকরা মেঘনার মোহনার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করতেন। বস্তুত মহানবি (সা.)-এর নবুয়তপূর্ব বহুকাল ধরেই আরব-ভারত-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরও এ সম্পর্ক অব্যাহত ছিল।

আরব মুসলিম বণিকরা তৎকালে এ পথ ধরেই বাণিজ্যযাত্রা অব্যাহত রাখেন। ফলে ইসলামের আবির্ভাবের অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আগমন করলেও আগত এসব আরব মুসলিম বণিক এ দেশের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তারা যেসব বন্দরে যাত্রাবিরতি করতেন সেখানে ইসলামের প্রচার করতেন। এভাবে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।

ঐতিহাসিকদের বড় একটি অংশের মতামত হলো-সাহাবিদের একটি দল প্রথম ইসলাম প্রচার করার জন্য ভারত ও বঙ্গ অঞ্চলে (বাংলাদেশে) আগমন করেন। আর তাদের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলামের সূচনা ঘটে। যেহেতু আরব-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, সেহেতু ভারত উপমহাদেশে সাহাবিদের আগমন অস্বাভাবিক ছিল না।

ধারণা করা হয়, রাসূল (সা.)-এর মামা সাহাবি আবু আক্কাস মালিক ইবনে ওয়াহাব (রা.) আনুমানিক ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে তার কতিপয় সাথিসহ ইসলাম প্রচারের জন্য চীনের উদ্দেশে দুটি জাহাজ নিয়ে রওনা হন। এ যাত্রায় কাইস ইবনে হুজাইফা (রা.), উরওয়া ইবনে আছাছা (রা.), আবু কায়েস ইবনে হারিস (রা.) প্রমুখ সাহাবি তার সঙ্গে ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল চীনে ধর্ম প্রচার করা।

এ লক্ষ্যে তারা আরব ও চীনের মধ্যবর্তী ভারতীয় বন্দরগুলোতেও অবতরণ করেন। তারা সেসব বন্দরে অবস্থানকালে ইসলাম প্রচার করেন। শায়খ যাইনুদ্দিন সীয় ‘তোহফাতুল মুজাহিদীন’ গ্রন্থে ভারতের নানা বন্দরে এরূপ একদল আরবের ইসলাম প্রচারকের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

কেননা সফরের রসদ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তৎকালে এসব বন্দরে অবতরণের কোনো বিকল্প ছিল না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, সাহাবিরা বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচারের সূচনা করে গেছেন। মূলত এভাবেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।

দাওয়াত ও তাবলীগ এবং আমাদের করণীয়

একজন মুসলমান হিসেবে প্রত্যেকেরই একটি দায়িত্ব হলো—নিজে সঠিক পথে চলা ও অন্যকেও সেই পথের দিকে আহ্বান করা।

১. নিজে আমল করা ও চরিত্র গঠন করা
দাওয়াত দেয়ার আগে নিজের চরিত্র, আমল ও চিন্তা-ভাবনায় ইসলামকে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে বলা হয়েছে:
"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মে আদেশ দাও আর নিজেদের ভুলে যাও?" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৪)
২. সঠিক জ্ঞান অর্জন করা
দাওয়াত দিতে হলে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি—তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি বিষয়ে।
৩. সুন্দরভাবে ও হিকমতের সাথে দাওয়াত দেওয়া
আল্লাহ বলেন:
"আপনার পালনকর্তার পথের দিকে ডাকুন হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে বিতর্ক করুন।" (সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)
৪. নরম ভাষা ব্যবহার ও ধৈর্যধারণ
দাওয়াত দেয়ার সময় কঠোর ভাষা নয়, বরং কোমলতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে হবে। কুরআনে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় বলা হয়:
"তোমরা তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।" (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ৪৪)
৫. অহংকার ও রূঢ়তা পরিহার করা
দাওয়াতের সময় আত্মঅহংকার, তুচ্ছতা ও আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকতে হবে। দাওয়াতদাতাকে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে।
৬. প্রয়োজনীয় সময়, পরিশ্রম ও ত্যাগ করা
দাওয়াত ও তাবলীগ শুধু মুখের কাজ নয়। এজন্য সময়, শ্রম, অর্থ ও মনের খরচ করতে হয়।

৭. দাওয়াতের কাজকে ধারাবাহিক ও সম্মিলিত করা

ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত যেমন জরুরি, তেমনি সমাজভিত্তিক ও সংগঠিতভাবে এই কাজ করা বেশি কার্যকর। তাবলীগ জামাত, ইসলামী সংগঠন ইত্যাদি এই কাজে সহায়ক হতে পারে।

৮. প্রতিটি স্তরের মানুষকে উপযোগী ভাষায় বোঝানো

বিচক্ষণতা অবলম্বন করে আলাদা শ্রেণির মানুষের কাছে তাদের ভাষায় এবং মানসিকতার আলোকে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

উপসংহার :

দাওয়াত ও তাবলীগ ইসলাম ধর্মের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ একটি দায়িত্ব ও মহান আমানত। এটি কেবল ওলামা বা দাঈদের একক দায়িত্ব নয়, বরং প্রতিটি মুসলমানের উপর তাদের জ্ঞানের পরিমাণ, অবস্থান ও সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ। দাওয়াত মানে হলো—মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা, তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে সচেতন করা এবং ভালো কাজে উৎসাহ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার আহ্বান জানানো।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর উপর সেই নববী দায়িত্বই ন্যস্ত হয়েছে—'তোমরাই তো একটি শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

কিন্তু আজ আমাদের অনেকেই দাওয়াত ও তাবলীগের এই গুরু দায়িত্ব ভুলে গেছি। কেউ অলসতায়, কেউ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায়, কেউ আবার আত্ম-অপমানবোধে বা অজুহাতে এই কাজ থেকে বিরত থাকি—যেমন, "আমি নিজেই ঠিক নই, কীভাবে আরেকজনকে বলবো?" অথচ, ইসলামে দাওয়াত এমন এক দায়িত্ব—যা পালনে মানুষ নিজেও সংশোধিত হয়, এবং সমাজও আলোকিত হয়।

যারা এই দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, তাদের জন্য কুরআনে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা অন্যকে মন্দ কাজ

থেকে নিষেধ করেনি। রাসূল (সাঃ) হুঁশিয়ার করে বলেছেন—যদি তোমরা দাওয়াত ও নসীহতের কাজ না করো, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন আজাব দেবেন, যা শুধু গোনাহগারদের উপর নয়, সবার উপর পড়বে।

তাই, একজন সচেতন মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত:

- নিজের আমল ও চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা,
- যেটুকু জানি, সেটুকু দিয়ে মানুষের উপকারে আসা,
- দাওয়াতের দায়িত্বকে অবহেলা না করে আন্তরিকতা ও হিকমতের সাথে তা পালন করা,
- পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশীসহ সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

এই কাজের মাধ্যমে আমরা যেমন নিজের পরকালের মুক্তির পথ সুগম করি, তেমনি সমাজকেও এক শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও আলোকিত পথে পরিচালিত করতে পারি।

পরিশেষে বলা যায়—দাওয়াত ও তাবলীগ এক ইবাদত, এক দায়িত্ব, এক ভালোবাসা, যা আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হওয়া উচিত।